ক্রীতদাস থেকে সাহাবী

এজেডএম শামসুল আলম

ক্রীতদাস থেকে সাহাবী

এ জেড এম শামসুল আলম

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাস থেকে সাহাবী

এ জেড এম শামসুল আলম

প্রকাশক

এস.এম. রইসউদ্দিন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

প্রধান কার্যালয়

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
ফোন -৬৩৭৫২৩ মোবাইল-০১৭১১৮১৬০০২

মতিঝিল কার্যালয়

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪
মোবাইল-০১৭১১৮১৬০০১

গ্রন্থ স্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক

প্রথম প্রকাশকাল ঃ

ফেব্রুয়ারী- ২০০৯
দ্বিতীয় সংস্করণ- জুন ২০১১
তৃতীয় সংস্করণ - অক্টোবর ২০১৫

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪, ৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ অলংকরণ

মুবাশ্বের মজুমদার

মূল্য ঃ ১৩০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০
ফোন- ৬৩৭৫২৩, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০২
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪, মোবাইল-০১৭১১-৮১৬০০১
১৫০-১৫২ গভ. নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫ ফোন-৯৬৬৩৮৬৩
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০-ফোন -৯৫৭৪৫৯০

Kritadash Theke Sahabi (From Slaves to Sahabi), Written in Bengali by AZM Shamsul Alam Chairman Bangladesh Cooperative Book Society Ltd. and Published by: S.M. Rais Uddin Director Publication. Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel B/A. Dhaka-1000.
Price : Tk. 130.00. US$ 5/- **ISBN. 984-70241-0001-6**

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

বেগম বদরুন নাহার
এর রুহের মাগফিরাত কামনায়

www.nagorikpathagar.org

লেখকের কথা

ক্রীতদাস সাহাবীদের মর্যাদা

প্রত্যেক প্রাণী এবং বস্তুর কিছু স্বকীয়তা আছে। এই স্বকীয়তা ছাড়া বস্তু অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। জবেহ করা প্রাণীর প্রাণ থাকে না। মাটি পুড়িয়ে ইট তৈরী করা হয়, পোড়ালে আর তা মাটি থাকে না। ইট দিয়ে কোন দেয়াল, সেতু বা ইমারত তৈরি করা হলে ইটের নিজস্ব স্বত্ত্বা লোপ পায়।

গাছ কেটে লাকড়ী করা হলে অথবা কোন ফার্নিচার তৈরি করা হলে তা আর গাছ থাকে না। নতুন বস্তুতে পরিণত হয়। গরু, ছাগল, মোরগ, মৃগ, জবাই করে মাংস এবং ব্যঞ্জনে পরিণত করা হয়।

দাস এমন মানব যাকে দাসে পরিণত করা হলে সে মৃত হয় না। বেঁচে থাকলেও মানুষ থাকে না। মুক্ত পাখি ও সামুদ্রিক মৎসের যতটুকু স্বাধীনতা থাকে একটি দাসের তা থাকে না। দাস বেঁচে থেকেও জীবন্ত মানুষের অধিকারহীন। সে না মৃত, না জীবন্ত। মালিকের দৃষ্টিতে না মানুষ, না পশু। দাসত্ব প্রথার ফলে সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মাখলুকাতের হতো- এ অবস্থা।

আরবে ইসলামের আবির্ভাবের ফলে মনুষ্যত্বের অধিকারহীন আরব দাসগণ কল্পনাতীত উৎকর্ষতায় পৌছেন।

প্রচার বিমুখতা

পূর্নিমার চন্দ্র ও ভোরের সূর্য দূর থেকে যত সুন্দর -নিকট থেকে তত উপভোগ্য তো নয়ই, সুন্দরও নয়। মানব প্রতিভার ক্ষেত্রেও তাই। দূর থেকে যত সম্মানজনক এবং শ্রদ্ধেয় মনে হয় নিকটে এলে তাদের প্রতি আকর্ষণ এবং মোহ তত দ্রুত লোপ পায়। এর একটি ব্যতিক্রম হল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং সঙ্গী সাহাবীদের ক্ষেত্রে।

লজ্জাশীলা এবং ধার্মিকা নারীরা তাদের সৌন্দর্য্য যেমন ঢেকে রাখতে সদা সতর্ক, সাহাবীগণ তাদের গুণাবলী ঢেকে রাখতে ছিলেন আরও বেশি উৎসাহী।

তাদের গুণাবলীর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ত্যাগ ও কুরবানী। স্বীয় সুপ্ত ইচ্ছা এবং অসতর্কতার ফলে ত্যাগ ও কুরবাণীর কাহিনী যত প্রচার হয়, ততই ত্যাগী ব্যক্তির ক্ষতি।

ত্যাগ কুরবানীর গোপন কথা, জানাজানি হয় আল্লাহ্ তা'য়ালার নিকট থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির দৃষ্টিকোন থেকে তা তত অর্থহীন হয়ে যায়।

সকল নেক আমলের পুরস্কার চাইতে হবে রাব্বুল ইজ্জত মহান আল্লাহ্তা'য়ালা থেকে। আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারও কাছে চাইলে তা হয়ে যায় নির্ভেজাল শির্‌ক্ এবং অর্থহীন।

মাওলার সন্তোষ

সাহাবীগণ আমল ও কুরবানী করতেন নিঃস্বার্থভাবে নয়। বরং দুনিয়ায় যা পুরস্কার পাওয়া যায়-তা থেকে শত কোটি গুণ বেশি পাওয়ার লক্ষে। লক্ষ কোটি গুণ বেশী পুরস্কার পাওয়া যায়- তার কাছ থেকে যিনি অভাবশূন্য, যার প্রতিদানের ক্ষমতা সীমাহীন এবং বেগাইরে হিসাব অর্থাৎ হিসাবের অতীত

www.nagorikpathagar.org

সাহাবীদের সকল আমলের মাকসুদ বা উদ্দেশ্য ছিল তাদের প্রভু-মাওলার সন্তোষ। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির ফলে তাঁরা মনুষ্যত্বের স্তর অতিক্রম করে ফেরেস্তার স্তরে পৌঁছে যান।

সাহাবীদের গুণের কথা-ছিটে ফোঁটা যা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এসেছে তা অত উঁচু মানের যে বর্তমান যুগের কোন বুজর্গ মহা পুরুষের সঙ্গে তাদের তুলনা হয় না।

দাসত্বের উৎকর্ষতা

নৈতিক গুণাবলীর বিকাশ যে শুধুমাত্র হযরত আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ), খালিদ (রাঃ) ইকরামা (রাঃ) প্রমুখ রাসূলুল্লাহ্‌র কুরাইশ বংশীয় বা মক্কার অভিজাত সম্ভ্রান্ত মানুষদের মধ্যে ঘটে তা নয়- সে কালের সর্বক্ষেত্রে অবহেলিত দাসদাসী এবং গোলাম, মিসকীনদের জীবন ও চরিত্রে দেখা যায় -মানবতার উৎকর্ষের অকল্পনীয় রূপ।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে এমন কোন মুসলিম জীবিত নেই যার মর্যাদা মুসলিমদের দৃষ্টিতে আরবের মুক্ত দাস-দাসী হযরত বিলাল (রাঃ), হযরত সালমান ফারসী (রাঃ), হযরত যায়েদ ইবনে হারিছাহ (রাঃ) অথবা হযরত বারাকাহ (রাঃ), হযরত সুমাইয়া (রাঃ) প্রমুখের সমমর্যাদা সম্পন্ন হবে।

মুক্ত দাস সাহাবী এবং সাহাবীয়ার সম্মান ইজ্জত বড় ব্যাপার। তাদের ব্যবহৃত কোনো বস্ত্র, বস্তু বা আসবাব-পত্র কেউ চিহ্নিত করতে পারলে এ গুলোর মর্যাদা ও গুরুত্ব সারা বিশ্বের মুসলিমদের দৃষ্টিতে যা হবে, তাও মুসলিম বিশ্বের যে কোন সাবেক বা বর্তমান রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী, রাজা-বাদশাহ, শিল্পপতি, সেনাপতি, বিচারক, শিল্পী, সাহিত্যিক, দানশীল, সমাজ সেবক অপেক্ষা হাজার লক্ষ গুণ বেশি। এটা সম্ভব হয়েছিল রাসূল (দঃ) এর মুহব্বাত, সঙ্গ এবং সান্নিধ্যের ফলে।

নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মর্যাদা

হযরত বিলাল (রাঃ), খাব্বার (রাঃ), যায়েদ (রাঃ), উসামা (রাঃ), বারাকা(রাঃ), সুমাইয়্যার (রাঃ) অপ্রয়োজনীয় অথবা ব্যবহারে অযোগ্য বস্তু-যেমন জুতা, খড়ম, চুল, নখ-যে কোন যুগের বা শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষীরা অশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে হাতে নেবে, চুমু দেবে, নয়নে, ললাটে স্পর্শ করাবে।

তাদের দাড়ী, নখ ও আসবাব পত্রের কিছু পেলে কাশ্মীরে যেমন হযরত বাল (চুল) দরগাহ গড়ে উঠেছে- তেমন বহু দরগা, মাজার গড়ে উঠত। লক্ষ লক্ষ সরল প্রাণ ব্যক্তি পাপ পূণ্য যাই হোক-কামাই এর উদ্দেশ্যে জিয়ারত করত।

এর দ্বারা এরূপ বস্তুর প্রতি যে কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয় তা নয়, বরং ঐ সমস্ত মহামানবদের স্মৃতির প্রতি কতটুকু আবেগ, অনুভূতি ও শ্রদ্ধা বিশ্ব মুসলিমের আছে- তা প্রতিফলিত হয়।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের একজন মুক্ত দাস দাসীর মর্যাদা বর্তমান যুগের যে কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতম মুসলিমের থেকে যে বেশী, কোন মুসলিমেরই এতে তো দ্বিমত ও সন্দেহ নেই।

এ জেড এম শামসুল আলম

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

ক্রীতদাস সাহাবীদের অনেকের সম্পর্কে বাংলা ভাষায় খুব কম পুস্তকই প্রকাশিত হয়েছে। হযরত বারাকাহ্‌র (রাঃ) ন্যায় মহান সাহাবীরাও আমাদের নিকট অপরিচিত। তার সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক বাংলা ভাষায় রচিত হয়নি। মুসলিম ইতিহাসে সর্বপ্রথম শহীদ হযরত সুমাইয়া (রাঃ) সম্বন্ধে প্রবন্ধ তেমন দেখা যায় না।

ক্রীতদাস সাহাবীদের সম্পর্কীয় এই পুস্তকটি পাঠ করলে ক্রীতদাস সাহাবীরা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর কত প্রিয় ছিলেন তার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

এ পুস্তক মহানবীর কয়েকজন মুক্ত দাসদাসী সাহাবীর বাস্তব কাহিনী উল্লেখ করা হল যা অলৌকিক কাহিনীকে হার মানায়।

ইমামুল আজম আবু হানিফা (রাঃ) (৮০ হিঃ- ১৫০ হিঃ) এর পিতামহ জাউতা ছিলেন একজন আফগান। তাকে তৎকালীন দাস ব্যবসায়ীগণ ধরে নিয়ে কুফার দাস বাজারে বিক্রয় করে। কালক্রমে তিনি মাওলা (আশ্রিত) এবং হালিফ (মিত্র) (৬৯৯ খ্রীঃ- ৭৬৭ খ্রীঃ) স্তরে উন্নিত হন।

হযরত আলী (রাঃ) ভিন্ন অন্য কোন সাহাবীর নামে কোনো শিয়া বা দলীয় জীবন যাত্রা পদ্ধতি চালু হয়নি। হযরত আবু বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ), যায়েদ (রাঃ) এর নামে কোন শিয়া অর্থাৎ দল বা মাজহাব সৃষ্টি হয়নি।

মুসলিম উম্মাহর সুন্নাহ একটিই, যার উৎস হল-রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)। হাদীসের পরেই যা বর্তমান দুনিয়ায় সংখ্যাধিক মুসলিমের অনুস্মরণীয় হেদায়েত- তা হল হানাফি ফিকাহ্‌।

ইসলাম মানুষকে মনুষ্যত্বের প্রাপ্য মর্যাদা দিয়ে থাকে। আরব না হয়েও একজন আফগান দাসের পৌত্র হয়ে ইমামুল আজম আবু হানিফার পক্ষে বর্তমান দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মুসলিমের ধর্মীয় ও প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে গণ্য হতে কোন অসুবিধা হয় নি।

বর্তমান কালের সঠিক অবক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর সাহাবীদের জীবন কাহিনী চর্চা যত বেশী হয় ততই আমাদের জন্যে কল্যানকর।

সাহাবীগণ নক্ষত্রের মত। তাদের যে কোন একজনকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুকরণ, অনুস্মরণ করা যায়-হিদায়াত এবং সঠিক দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ "ক্রীতদাস থেকে সাহাবী" পুস্তকখানা প্রকাশ করে ইসলামের সু-মহান শিক্ষা বিষয়ক বইটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা মহান আল্লাহতায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি। ২০০৯ সালে "ক্রীতদাস থেকে সাহাবী" বইটি সোসাইটি কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। ২০১১ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ করা হয়। পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী বইটির তৃতীয় সংস্করণ করা হলো।

(এস.এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

১। হযরত বারাকাহ্ বিনতে ছালাবা (রাঃ) ০৯
২। হযরত উম্মে আইমান বারাকাহ্ (রাঃ)............................১৭
৩। হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রাঃ) ২৫
৪। হযরত যায়েদ (রাঃ) এর বৈবাহিক জীবন.........................৩২
৫। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) ৪০
৬। হযরত সুমাইয়া বিনতে খাবাত (রাঃ)............................৪৬
৭। হযরত ইয়াসির ইবনে আমীর (রাঃ) ৪৮
৮। হযরত আম্মার ইবনে সুমাইয়া (রাঃ) ৫০
৯। হযরত সুহায়ব আর রুমী (রাঃ) ৫৩
১০। মদীনায় হযরত সুহাইব আর রুমী (রাঃ) ৫৯
১১। হযরত সালিম মাওলা হুযায়ফা (রাঃ) ৬৫
১২। হযরত খাব্বাব ইবনে আল-আরাত (রাঃ)........................৭৩
১৩। নির্যাতীত হযরত খাব্বাব আরাত (রাঃ) ৭৯
১৪। হযরত জুলাইবিব (রাঃ) ৮৬
১৫। দু'জন রাবাহ (রাঃ) ৯০
১৬। আমীর ইবনে ফুহায়রা (রাঃ) ৯১
১৭। হযরত সালমান ফারসীর (রাঃ) প্রাথমিক জীবন ৯৩
১৮। সত্যের সন্ধানের সালমান ফারসীর (রাঃ) বৈশিষ্ট্য ৯৭
১৯। হযরত সালমান ফারসী এর চরিত্র ১০৫
২০। নির্যাতীত হযরত বিলাল ইবন রাবাহ (রাঃ)....................১১৩
২১। মুজাহিদ হযরত বিলাল (রাঃ) ১১৯
২২। রাসূলের মুয়াজ্জিন বিলাল (রাঃ) ১২৪
২৩। নবীর ব্যক্তিগত সহকারী বিলাল (রাঃ) ১২৯
২৪। পরিশিষ্ট ১৩৪

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

হযরত বারাকাহ (রাঃ)

বারাকাহ বিনতে ছালাবা (রাঃ) ছিলেন এক অসামান্য হাবশী বালিকা তিনি হাবশী হলেও ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভুত। বারাকাহর বংশ পরিচয় নিম্নরূপঃ বারাকাহ বিনতে ছালাবা ইবনে আমর ইবনে হিসন ইবনে মালিক ইবনে নুমান ইবনে সালামা ইবনে আমর।

কিশোরী বারাকাহকে দাস ব্যবসায়ীরা মক্কার দাস-দাসী বেঁচা কেনার বাজারে বিক্রয়ের জন্য নিয়ে আসে। কুরাইশ সর্দার আব্দুল মোত্তালিবের পুত্র আব্দুল্লাহ্‌র বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে মদীনার আব্দুল ওহাবের কন্যা আমিনার সঙ্গে।

আমিনার পিতামহ আব্দুল মনাফ এর পিতা যোহরা ছিলেন মক্কাবাসী কুরাইশ। আমিনার মা বাররাহ্ এর পিতা ছিলেন আব্দুল উজ্জা। তাঁর পিতা উসমান এবং পিতামহ আব্দুদ দার। আব্দুদ দার ছিলেন মক্কার অন্যতম সম্ভ্রান্ত কুরাইশ ব্যক্তিত্ব। আমিনা স্বীয় পিতা এবং মাতা উভয়ের দিক দিয়ে ছিলেন অভিজাত বংশের কন্যা।

আমিনার খেদমতের জন্য আব্দুল মোত্তালিবের পুত্র আব্দুল্লাহ কিশোরী বারাকাহকে মক্কার দাস বাজার থেকে ক্রয় করে ছিলেন নববিবাহিতা পত্নি আমিনাকে উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে।

আবদুল্লাহর বিবাহ

অল্প বয়সে বারাকাহ (রাঃ) পিতামাতার কোল থেকে বিচ্যুত হন। তবে তাঁর ভাগ্য অন্য দাসী বালিকাদের থেকে ছিল হাজার লক্ষ গুণ ভাল।

আমিনা ছিলেন অতি মহান হৃদয়ের অধিকারীনী। তিনি কিশোরী বারাকাহকে দাসী অপেক্ষা সঙ্গিনী বা সাথী হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। আমিনা এবং আব্দুল্লাহ্‌র বিয়ের দু'সপ্তাহ পরেই মক্কা হতে একটি বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া যাচ্ছিল। বছরে দু'বারই এরূপ বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়ায় গমণ করত। তাই আব্দুল মুত্তালিব সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাঁর নব বিবাহিত এবং কনিষ্ঠ পুত্র আব্দুল্লাহ্ বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া যাবে।

আব্দুল্লাহ ছিলেন দেহাবয়বে আরবের অন্যতম সুদর্শন যুবক। সুস্থাস্থ্যবান এবং বলিষ্ঠ। তাঁর ব্যবহার, আচরণ ছিল দৈহিক সৌন্দর্যেরই অনুরূপ। এরূপ ব্যক্তিকে স্বামী হিসেবে পেয়ে আমিনা নিজেকে ধন্য এবং সৌভাগ্যবতী মনে করতেন।

www.nagorikpathagar.org

বিয়ের দু'সপ্তাহের মধ্যেই তাকে স্বামী সংসর্গ হারাতে হবে এতে আমিনা মৃদু প্রতিবাদ জানালেন। বললেন- আমার হাতের মেহেদী রঙ এখনও শুকায়নি। এ দুর্ভাগ্য ও বিচ্ছেদ বেদনা কিভাবে আমি সহ্য করিব ? আমিনা এ সিদ্ধান্তে ছিলেন মর্মাহত।

স্বামীর প্রস্থানের পরই আমিনা আর্ত চিৎকারে চেতনাহীন এবং অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাঁর সেবিকা বারাকাহ (রাঃ)ও কান্না শুরু করে দেন। অশ্রু ধারায় তাঁর বস্ত্রও সিক্ত হতে লাগল। আমিনার অজ্ঞান দেহের পাশে উপবিষ্ঠা দিলেন দাসী কিশোরী বারাকাহ (রাঃ)। বহুক্ষণ পর আমিনার জ্ঞান ফিরে আসল। ততক্ষণ পর্যন্ত আমিনা ভূমি তলেই পড়ে ছিলেন।

চেতনা ফিরে পাওয়ার পর বারাকাহকে বললেন "আমি বড় দূর্বল। আমাকে ধরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দাও। এর পর বহুদিন আমিনা শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি থাকতেন নিরব, নির্বাক। কেউ কোন প্রশ্ন করলে জবাব দিতেন ইশারা আশারায়, চোখের ভাষায়। উঠে বসতেন শুধুমাত্র সর্বজন শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ আব্দুল মোত্তালিবের তাঁর শয্যা পার্শ্বে আগমনে।

আমীনার স্বপ্ন

আব্দুল্লাহ্র সিরিয়ার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগের দু'মাস পর আমিনা এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন ভঙ্গের পর তিনি হয়ে উঠলেন আনন্দে উদ্বেল এবং উৎফুল্ল। স্বামী হারানোর বেদনার ছায়া তার মুখমন্ডল হতে যেন মিলিয়ে গেল। এ সু-স্বপ্ন তিনি তাঁর একমাত্র সঙ্গী বারাকাহ হতে গোপন রাখতে পারলেন না।

আমিনা বারাকাকে বললেন–আমি স্বপ্নে দেখেছি যে–আমার তলপেট থেকে আলো বেরিয়ে আসছে। এ আলোতে মক্কার চারদিকের পাহাড়, পর্বত এবং উপত্যকা আলোকাজ্জ্বল হয়ে উঠছে। বারাকাহ (রাঃ) জানতে চাইলেন–আমিনা নিজেকে গর্ভবতী অনুভব করেন কি না? আমিনা হ্যাঁ সূচক জবাব দিলেন এবং বললেন গর্ভবতীরা যেরূপ অসুবিধা অনুভব করে তাঁর তো সেরূপ কষ্ট হচ্ছে না। বারাকাহ (রাঃ) তাকে আশ্বস্ত করলেন যে–অবশ্যই আমিনা এক নেক এবং সৌভাগ্যবান সন্তানের জন্ম দেবেন।

আব্দুল্লাহ্র অনুপস্থিতিতে এবং চরম দুঃখ বেদনা ও উৎকণ্ঠায় আমিনার দিন কাটতে লাগল। আমিনা সব সময়ই চুপ-চাপ এবং চিন্তাগ্রস্থ থাকতেন। বিরহ, বেদনা ও উৎকণ্ঠায়, আহারে অনীহায়, বিনীদ্র রজনী যাপনে আমিনার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে লাগল। এ সময় তাঁর নিত্যে দিনের সঙ্গী ও সান্তনা দানকারী ছিল কিশোরী বারাকাহ (রাঃ)।

www.nagorikpathagar.org

আবরাহার মক্কা অভিযান

আমিনার সন্তান প্রসবের পূর্বেই ঘটল আরেক দূর্ঘটনা। ইয়েমেনের সম্রাট আবরাহা বিরাট হস্তি বাহিনী নিয়ে এসেছেন মক্কা আক্রমণ এবং কাবা ধ্বংসের মানসে। সম্রাট আবরাহা আল-আশরাম ইয়েমেনে নির্মাণ করেছেন এক তীর্থস্থান। তথায় সুন্দরতর এক কাবা গৃহ স্থাপন করা হয়েছিল। তবে তা কৃষ্ণ বর্ণের ছিল না। সোনালী রঙ দিয়ে তা আকর্ষণীয় করা হয়েছিল। কিন্তু, আবরাহার কাবা যেয়ারতে দেশ বিদেশ থেকে তীর্থ যাত্রীরা ছুটে আসত না। তখন আবরাহা ভাবলেন মক্কায় অবস্থিত প্রাচীন ক্বাবা গৃহ ধ্বংস করা হলে নব্য ক্বাবা জনপ্রিয় হবে। তীর্থযাত্রীর সংখ্যা বাড়বে।

তৎকালে সেনাদল যখন কোন দেশ অতিক্রম করত, তারা স্থানীয় জনসাধারণকে পরিণত করত সেবাদাস শ্রমিকে। সেনাবাহিনীর মালপত্র বহনের জন্য প্রয়োজন হত লোকবল। তাদের জন্য খাদ্য সামগ্রী কখন স্বল্প মূল্যে কখন বিনা মূল্যে সরবরাহ করতে হতো স্থানীয় অধিবাসীদেরকে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক নারীদেরকেও আক্রমণকারী সেনাবাহিনীর বহুবিধ প্রয়োজন পূরণ ও ভোজ্য দ্রব্যে পরিণত করা হত।

মক্কা ত্যাগের নির্দেশ

মক্কার কুরাইশ সর্দার আব্দুল মোত্তালিব হুকুম জারী করলেন যে, সকল অধিবাসীকে ঘর বাড়ী ত্যাগ করে পাহাড় পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। আবরাহা আল-আশরাম মক্কা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তাদেরকে গীরি গুহা ও উপত্যকায় বসবাস করতে হবে।

পুত্রবধূ আমিনাকেও নগরী ত্যাগের জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। কিন্তু অসুস্থ আমিনার পক্ষে মক্কা ত্যাগের প্রস্তুতির কোন লক্ষণ দেখা গেল না। অসুস্থ থাকার কারণে বার বার এসে প্রস্তুতির জন্য তাগীদ দিচ্ছেন বৃদ্ধ আব্দুল মোত্তালিব। সৌম্য শান্ত আমিনা নির্বিকার। রাগ ও ক্রোধে ফেটে পড়লেন আব্দুল মোত্তালিব। তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের সম্ভাব্য বিপদের কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন। হুকুম জারি করলেন, যত কষ্টই হোক আমিনাকে মক্কা ত্যাগ করতেই হবে।

অশান্ত ও ধৈর্যহারা আব্দুল মোত্তালিবকে এক পর্যায়ে আমিনা বলেই ফেললেন যে, গর্ভবতী হওয়ার কারণে আমিনার পক্ষে পাহাড়ে উঠা সম্ভব হবে না। তদুপরি আব্দুল মোত্তালিবকে আশ্বাস দিলেন যে, সম্রাট আবরাহা কিছুতেই মক্কা প্রবেশ করতে পারবে না। ক্বাবার কোন ক্ষতিই হবে না। ক্বাবার অধিপতি ক্বাবাকে রক্ষা করবেন।

www.nagorikpathagar.org

এ ধরনের মেয়েলী আশ্বাসবাণীতে আশ্বস্থ হওয়ার মত অবিবেচক আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন না। তাই তিনি আমিনাকে পুস্তুতি নেয়ার জন্যে রাগত স্বরে কড়া হুকুম জারী করলেন। কিন্তু আমিনার মধ্যে কোন রকম ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। এক পর্যায়ে আমিনা বলেই ফেললেন, শীঘ্রই আমার সৌভাগ্যবান সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে। আবরাহা মক্কার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। আমার সন্তানের উছিলায়ই মক্কা ধ্বংস থেকে রক্ষা পাবে। আব্দুল মোত্তালিব এ সমস্ত গর্ভবতীর কল্পনা ও সুখ স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিলেন।

আবরাহার ধ্বংস

মক্কার দু'মাইল দূরে মুজদালাফায় চড়ুই পাখির মত আবাবিল পাখির আক্রমণে আবরাহার হস্তিবাহিনী ধ্বংস হল এবং আবরাহা সৈন্যসহ মাটির নিচে ডেবে গেলেন।

এ ঘটনায় আব্দুল মুত্তালিবের দৃষ্টিতে আমিনার গুরুত্ব এবং মর্যাদা অনেকখানি বৃদ্ধি পেল। কিন্তু আমিনার হৃদয়ে স্বামীর বিচ্ছেদ বেদনার বিন্দুমাত্র উপশম হল না।

বারাকাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন – "আমি আমিনার পদতলেই ঘুমাতাম। রাতে তাঁর বাকরুদ্ধ কণ্ঠধ্বনী শ্রবণ করতাম। তাঁর কান্নায় বহু সময় আমার নিদ্রা ভেঙ্গে যেত। আমি তাকে সান্তনা ও সাহস দিতে চেষ্টা করতাম।"

আবদুল্লাহ্‌র মৃত্যু

আবরাহা বাহিনীই ধ্বংসের পর সিরিয়া থেকে বাণিজ্য কাফেলা সমূহ মক্কায় ফিরে আসতে লাগল। কোন কাফেলার আগমনের খবর শুনেই বারাকাহ (রাঃ) আব্দুল মোত্তালিবের গৃহে ছুটে যেতেন। আব্দুল মুত্তালিবও উৎকণ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ্‌র কোন খবরই পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত মক্কাবাসীদের সিরীয়াগামী শেষ দলটিও ফিরে এল। কিন্তু আব্দুল্লাহ এল না।

পরিশেষে ইয়াস্রিব থেকে নির্ভরযোগ্য খবর এল যে–আব্দুল্লাহ পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এক রবিউল আউয়াল মাসের রজনীর শেষ ভাগে শিশু মুহাম্মাদ (সাঃ) ধরাতে ভূমিষ্ট হলেন। আল্লাহ্‌র নূরে বিশ্ব আলোকিত হয়ে উঠল। আনন্দে ব্যাকুল হয়ে উঠে ফেরেস্তাগণ ও সৃষ্টিকুল।

শিশু মুহাম্মাদের জন্ম

বারাকাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে শিশু মুহাম্মাদকে জন্মের পর তিনিই কোলে নিয়েছিলেন। খবর পেয়ে ছুটে এলেন আব্দুল মুত্তালিব। তিনি পৌত্রকে কোলে নিয়ে কাবা চত্তরে উপস্থিত হলেন। ঘোষণা করলেন এ শিশু আমার পৌত্র। আমার পুত্র

www.nagorikpathagar.org

আব্দুল্লাহ্‌র বরকতময় উত্তরাধিকার। সমবেত কুরাইশগণ আব্দুল মোত্তালিবের পৌত্র সন্তান জন্মতে আনন্দিত হল এবং আনন্দ প্রকাশে উৎসবের আয়োজন ঘটাল।

আব্দুল মুত্তালিবের গৃহে আব্দুল্লাহ্‌র মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বারাকাহ (রাঃ) অব্যক্ত বেদনায় চিৎকার করে উঠলেন। তিনি পাগলের মত বিলাপ করতে করতে আমিনার গৃহপানে ছুটে গেলেন। খবর শুনার সঙ্গে সঙ্গেই আমিনা সজ্ঞাহারা হলেন। তাঁর শয্যাপাশে ছিলেন বারাকাহ (রাঃ)। এ সমেয় আমিনার দেখা শুনা, সেবা-শুশ্রূষা বারাকাহই করতেন।

শিশু মুহাম্মাদকে প্রথম দুধ পান করান তাঁর মাতা। দু'তিন দিন পর স্তন্য পান করান আবু লাহাব এর দাসী সুওয়াইবা (বুখারী)। এ দাসী সুওয়াইবা আব্দুল মুত্তালিব এর পুত্র হামজাকেও দুধ পান করিয়েছিলেন। সুওয়াইবার যে পুত্রটি শিশু মুহাম্মাদের সঙ্গে সুওয়াইবার দুগ্ধ পান করত তাঁর নাম ছিল মাসরূহ।

ধাত্রী হালিমা

জন্মের কিছু কাল পরেই মক্কার অভিজাত শ্রেণীর প্রথামত হালীমা আস-সাদিয়া নামক এক ধাত্রী শিশু মুহাম্মাদকে লালন-পালন ও দুগ্ধ সেবনের জন্য 'বাদীয়া' মরুদ্যানে নিয়ে গেলেন। উন্মুক্ত মরুর বুকে এ মরুদ্যানটি ছিল অত্যান্ত স্বাস্থ্যপ্রদ। মরুদ্যানের লোকজনের উচ্চারণ ছিল সুস্পষ্ট এবং বিশুদ্ধ।

শিশু মুহাম্মাদ (সাঃ) ধাত্রী মাতা হালিমার যে পুত্রের সঙ্গে দুগ্ধ পান করতেন তার নাম আবদুল্লাহ। দু'শিশুকে দেখাশুনা করতেন আবদুল্লাহর ভগ্নি শায়মা। হালিমার অপর দু'কন্যার নাম ছিল আনিসা এবং হুজায়ফা।

দু'বছর পর ধাত্রীমাতা হালীমা আস-সাদিয়া তাকে মক্কায় ফেরত নিয়ে এলেন। মক্কায় ছিল তখন বিভিন্ন মহামারীর প্রাদুর্ভাব। তাই নিরাপত্তা জনিত কারণেই আমিনা শিশুকে ফেরৎ পাঠালেন 'বাদীয়া' মরুদ্যানে। সর্বমোট ৫ বছরের পর হালিমা শিশুকে মক্কা নিয়ে আসেন। আমিনা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সন্তানকে বুকে টেনে নিলেন।

আরবের বিধবা নারীদের বিবাহ হয় অতি দ্রুত। হযরত আবু বাকারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তার দু'বিধবা স্ত্রীর বিয়ে হয় হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) সঙ্গে। আব্দুল্লহ এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুহাম্মাদকে কোলে পাওয়ার স্বপ্নে আমিনা এত বিভোর ছিলেন যে নতুন করে বিবাহিত হওয়ার কল্পনা তাঁর হৃদয়ে স্থান পায়নি।

www.nagorikpathagar.org

আমিনার মদীনা সফর

শিশু মুহাম্মাদের বয়স যখন ৬ বছর আমিনা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি সন্তানসহ স্বামীর কবর দর্শনে যাবেন। এতে আপত্তি জানালেন বৃদ্ধ আব্দুল মোত্তালিব এবং বারাকাহ (রাঃ)। কিন্তু আমিনা ছিলেন সিদ্ধান্তে দৃঢ়চিত্ত। তিনি ইয়াস্রিবে যাবেনই।

অনেক আলাপ আলোচনা তর্ক বিতর্কের পর আব্দুল মোত্তালিব হার মানলেন। তবে সিরিয়া গামী একটি কাফেলার সঙ্গে তাদেরকে ইয়াস্রিব যেতে অনুমতি দিলেন। তিনজনই একটি বড় উটে রওয়ানা হলেন। মদীনার তৎকালীন নাম ছিল ইয়াস্রিব।

ছয় বছরের শিশু মুহাম্মাদকে আমিনা কোথায় এবং কেন যাচ্ছেন কিছুই বলেননি। উষ্ট্র পিঠে থাকাকালে আমিনা ক্রমাগত অশ্রুপাত করতেন। শিশু পুত্রের জন্য শান্ত হওয়ার জন্য বারাকাহ (রাঃ) আমিনাকে অনুরোধ করতেন। মায়ের অশ্রু বিসর্জনের সময়ে মুহাম্মাদ (সাঃ) বারাকাহর কোলে বসে থাকতেন।

কবর যিয়ারাত

দশ দিনের কাফেলাটি ইয়াস্রিব পৌছল। মদীনার বনু নাজ্জার গোত্রের মাতুলদের নিকট শিশুপুত্র মুহাম্মাদকে রেখে প্রায় প্রত্যেক দিন আমিনা স্বামী আব্দুল্লাহ্র কবরের কাছে যেতেন এবং বিলাপ করতেন।

একাধারে প্রায় ৪০ দিন পর্যন্ত আমিনা স্বামীর কবর যেয়ারত করেন। কোন কোন সময় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কবরের কাছেই পড়ে থাকতেন। শোকে দুঃখে তিনি এত দুর্বল হয়ে পড়েছেন যে হাঁটা চলার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেললেন।

এ সফরে একবারও আমিনা কবর জেয়ারতে যাওয়ার সময় শিশু মুহাম্মাদকে সাথে নিতেন না। কবরে সারা দিন তাঁর কান্নায় শিশুর মন ভেঙ্গে যেতে পারে এ ভয় করতেন তিনি। মদীনায় কিছুকাল অবস্থানের পর আমিনা মক্কার উদ্দেশ্যে মদীনা বা ইয়াস্রিব ত্যাগ করলেন।

আমিনার করুণ মৃত্যু

মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি আল-আবওয়া নামক স্থানে এসে আমিনা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর দেহের তাপ অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেল। তারা একটি মরুদ্যানে থামলেন। মাথা ব্যথায় অসহ্য কষ্ট হচ্ছিল আমিনার। গভীর অন্ধকারে আমিনা বারাকাহকে কাছে টেনে নিলেন। বাকরুদ্ধ কণ্ঠে তাকে বললেন, ও বারাকাহ! আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই এ দুনিয়া ছেড়ে যাব। আমি আমার শিশুটিকে তোমার হাতেই দিয়ে যাচ্ছি। গর্ভে থাকাকালে সে তাঁর পিতাকে হারিয়েছে। এখন তাঁর

www.nagorikpathagar.org

চোখের সামনে মাকেও হারাচ্ছে। এখন থেকে তুমি তাঁর মা। কখন তাকে ছেড়ে যেওনা।”

বারাকাহ বর্ণনা করেছেন, “আমিনার কথা শুনে আমার হৃদয় ভেঙ্গে গেল। আমি কান্না এবং বিলাপ শুরু করলাম। আমার চিৎকার এবং কান্নায় শিশুটি ভীতবিহ্বল হয়ে পড়ল। সেও কান্না শুরু করে দিল। ভয়ে মায়ের কোলে ঝাপিয়ে পড়ল। দু'হাত দিয়ে এমন ভাবে মাকে জড়িয়ে ধরল যে তাঁর শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হল। আমিনাও শিশুর সঙ্গেই ডুকরে কেঁদে উঠলেন। তারপর চির কালের জন্য নিরব হয়ে গেলেন”।

বারাকাহও কাঁদলেন। গভীরভাবে কাঁদলেন। সে দিন মরুর বুকে ছিল বারাকাহ (রাঃ) এবং শিশুটি আর আমিনার প্রাণহীন দেহ।

নিকটে সে অবস্থায় অন্য কোন মানুষ ছিল না। প্রবল বাতাস বইতেছিল। চারিদিকে ধুলি ঝড় উঠছিল। আমিনার দেহ নিরব, নিস্তব্ধ। বারাকাহ (রাঃ) এবং শিশুটির কণ্ঠে কান্না। নিজের হাতে বারাকাহ (রাঃ) মরুর বালি সরিয়ে কবরের মত করে ফেললেন। আর আমিনার মৃত দেহ টেনে ঠেলে সেখানে স্থাপন করলেন। ধুলি ঝড়ে শিঘ্রই গর্তটি ভরে গেল।

কবরের পাশে বসে দু'টি প্রাণী দীর্ঘ সময় অশ্রু বিসর্জন করছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত নয়নে অশ্রু ছিল বারাকাহ (রাঃ) তা বিসর্জন করেছেন। তারপর শিশুটিকে নিয়ে মক্কায় ফিরে এসে তাঁর পিতামহ আবদুল মোত্তালিবের হাতে তাকে অর্পন করেন।

জীবনব্যাপী ধাত্রী

শিশুটিকে দেখা শুনার দায়িত্ব আবদুল মোত্তালিব গ্রহণ করেন। দু'বছর পর আবদুল মুত্তালিব মৃত্যু বরণ করেন। বালক মুহাম্মাদ সহ বারাকাহ (রাঃ) তখন শিশুটির পিতৃব্য আবু তালিবের পরিবারে স্থানান্তরিত হয়। কিশোর মুহাম্মাদের সেবা, যত্ন ও পরিচর্যায় বারাকাহর জীবন উৎসর্গীকৃত ছিল।

খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ এর সঙ্গে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পরিণয় পর্যন্ত তাঁর সেবা এবং পরিচর্যার দায়িত্ব ছিল বারাকাহর উপর। বিয়ের পর বারাকাহ (রাঃ) এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) খাদিজার বাড়ীতে উঠে আসেন।

খাদিজার বাড়ীতেও হযরত মুহাম্মাদের সেবার দায়িত্ব ছিল বারাকাহর উপর। বারাকাহ (রাঃ) বলেছেন “আমি তাকে কখনও ছেড়ে যাইনি। তিনি কখনও আমাকে ত্যাগ করেন নি।”

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে উম্মু আয়মান (রাঃ) বারাকাহ (রাঃ) প্রাণাধিক ভালবাসতেন। তারই সেবার জন্য হযরত বারাকাহ (রাঃ) সুদীর্ঘকাল বিবাহ করেননি।

ভাবমূর্তি

উম্মে আয়মান বারাকাহর প্রতি সমকালীন লোকদের শ্রদ্ধা ও সম্মান কিরূপ ছিল তা একটি ছোট ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট হয়।

মদীনায় এক ব্যক্তি তাচ্ছিল্যভরে হযরত বারাকাহ বিনতে ছালাবার নাম উল্লেখ করেছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল মদীনার কাজী আবু বাকার ইবনে হাজমের সম্মুখে। ঐ ব্যক্তিকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হযরত বারাকাহর নাম উচ্চারণ করায় কাজী উক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি হিসেবে সত্তরটি চাবুক মারার হুকুম দিয়েছিলেন যা বাস্তবায়িত হয়।

এ সামান্য ঘটনায় এ কঠোর শাস্তির কারণ আসামী জিজ্ঞাসা করায় মদীনার কাজী আবু বাকার ইবনে হাজম জবাবে বলেন– রাসূল যাকে মা বলে সম্বোধন করতেন তাকে তুমি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নাম ধরে ডাকছ। তোমাকে ক্ষমা করলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে ক্ষমা করবেন না। (ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃঃ ৫৮)।

www.nagorikpathagar.org

হযরত উম্মে আইমান বারাকাহ (রাঃ)

আরকাম ইবনে আরকাম

একদিন বিবি খাদিজা (রাঃ) নও মুসলিমদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত অত্যন্ত জরুরী খবর রাসূলুল্লাহ্‌র নিকট প্রেরণ করা প্রয়োজন মনে করলেন। সে মুহূর্তে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ খবর তাৎক্ষণিকভাবে প্রেরণের জন্য অন্য কোন পুরুষ পাওয়া যায়নি। বারাকাহর (রাঃ) বয়স তখন ৫০ উর্দ্ধ। তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অতি দ্রুত আল-আরকামের গৃহে খবরটি নিয়ে পৌছেন। এ গুরুত্বপূর্ণ খবর পেয়ে রাসূল (সাঃ) নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান মনে করলেন। তিনি উম্মে আইমান (আইমানের মাকে) লক্ষ্য করে বললেন। "তুমি সৌভাগ্যবতী হে উম্মে আইমান (বারাকা)! তোমার স্থান অবশ্যই জান্নাতে।"

ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবী আরকাম ইবনে আরকামের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এটাই ছিল নও মুসলিমদের সর্ব প্রথম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

বারাকাহর বিবাহ

একদিন হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) বারাকাহকে ডেকে বললেন, "ইয়া উম্মি! হে আমার মা! এখন আমি একজন বিবাহিত যুবক। আর আপনি এখন অবিবাহিতা। যদি কোন আগ্রহী ব্যক্তি আপনাকে বিয়ের প্রস্তাব করেন - আপনি কি তাতে সম্মত হবেন?

সম্মুখে উপবিষ্টা ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর স্ত্রী খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রাঃ)। বারাকাহ (রাঃ) মাথা তুলে হযরত মুহাম্মাদের (সঃ) দিকে তাকালেন এবং বললেন "আমি কখন তোমাকে ত্যাগ করতে পারব না। কোন মা কী তার সন্তানকে ছেড়ে যেতে পারে"?

বারাকাহর কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্মিত হাসলেন। এগিয়ে এসে তাঁর মাথায় চুমু খেলেন। স্ত্রী খাদিজার (রাঃ) দিকে তাকিয় বললেন– "এই সেই বারাকাহ! যে আমার মায়ের পর আমার মা। তিনি আমার পরিবারের একজন।"

বারাকাহ(রাঃ) তখন রাসূলুল্লাহ্‌র স্ত্রী খাদিজার দিকে তাকালেন। খাদিজা বারাকাহকে বললেন– 'হে বারাকাহ ! মুহাম্মাদের জন্যই আপনার জীবন ও যৌবনকে

www.nagorikpathagar.org

বিসর্জন দিয়েছেন আপনি। এখন তিনি তাঁর প্রতি কৃত দায়িত্বের কিছুটা প্রতিদান দিতে চান। মুহাম্মাদের, জীবনের কসম করে বলছি – বাধর্ক্যে উপনীত হওয়ার পূর্বেই আপনি একটি বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হয়ে যান।

বারাকাহ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন হে মহীয়সী নারী। কে আমাকে বিয়ে করবে? খাদিজা (রাঃ) বললেন– ইয়াস্রিব (মদীনার) অধিবাসী খাজরাজ গোত্রের বানু হারীছ শাখার উবাইদ ইবনে যায়দ। তিনি আপনার পানি প্রার্থনা করতে এসেছেন আমাদের কাছে। অন্তত আমার সম্মানার্থে হলেও আপনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবেন না।" বারাকাহ (রাঃ) তাতে সম্মত হলেন। বারাকাহ (রাঃ) অগত্য বারাকাহ (রাঃ) এবং উবাইদ ইবনে যায়েদ খাজরাজীর বিয়ে হয়ে গেল। বিবাহের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত বারাকাকে আজাদ করে দেন। স্বামীর সঙ্গে বারাকাহ ইয়াস্রীব মদীনায় চলে গেলেন। তাদের ঘরে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হল। তার নাম রাখা হল আইমান। তার পরেই লোকজন তাকে উম্মু আইমান বা আইমানের মা বলে সম্বোধন করা শুরু করল।

বারাকাহর এই বিয়ে স্বল্প স্থায়ী হয়। তাঁর প্রথম স্বামী উবায়েদ ইবনে যায়দ মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তখনও উম্মুল মুমিনিন খাদিজা (রাঃ) জীবিত ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর বারাকাহ (রাঃ) পালিত পুত্র মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং উম্মুল মুমিনিন খাদিজার (রাঃ) ঘরে ফিরে আসেন এবং একই সংসারের সদস্য হন।

হিযরত

রাসূলুল্লাহ্ ইয়াস্রিবে (মদীনায়) হিজরত করে যাওয়ার সময় তাঁর ঘর সংসার দেখার দায়িত্বে রেখে যান উম্মে আয়মানকে। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ্‌র সোহবৎ বা সান্নিধ্য বিচ্যুত হয়ে মক্কায় থাকতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিলেন না। সুযোগ বুঝে তিনি মদীনায় প্রস্থান করেন। মদীনায় হিজরতের পূর্বে বারাকাহ প্রথম হিজরত করেছিলেন আবিসিনিয়ায়। (ইবনে সা'দ ঃ তাবাকাত, ৮ম খন্ড, পৃঃ ২২৩-২২৬)।

রাসূলুল্লাহ্‌র পরিবারের সদস্য হিসেবে উম্মে আয়মান ছিলেন শত্রুদেরও পরিচিত। তাই তিনি সহজ ও পরিচিত পথে না গিয়ে মরুভূমি ও পার্বত্য পথ অবলম্বন করেন। মক্কা মদীনার মধ্যে তাঁর ইতিপূর্বে যাতায়াতের অভিজ্ঞতা ছিল। তবে পূর্বেকার সফরগুলো ছিল উষ্ট্রপৃষ্ঠে। এবারকার সফল ছিল পদভ্রজে। তদুপরি তিনি ছিলেন বৃদ্ধা।

মরুভূমির প্রখর উত্তাপে বিদ্ধ এবং বালি ঝড়ে তিনি পড়েছিলেন বহুবার। কিন্তু কিছুই তাঁর পুত্র মুহাম্মাদের সঙ্গে মিলনের তৃষ্ণাকে ধাবিত করতে পারেনি। তাঁর

www.nagorikpathagar.org

মদীনায় হিজরত কালে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে এবং অলৌকিকভাবে তিনি বেঁচে যান।

মদীনায় সুদীর্ঘ হিজরতের জন্য না ছিল বারাকার কোন সঙ্গী, না ছিল পাথেয়, না ছিল বাহন। মহান রাব্বুল আলামীনের উপর তাওয়াক্কুল করেই তিনি মদীনা রওয়ানা হন।

বহু কষ্ট-যাতণার পর মদীনার নিকটবর্তী মুনসারিফ নামক স্থানে বারাকাহ (রাঃ) পৌছেন। ঐ দিন তিনি রোযাও রেখেছিলেন। ইফতার করার মত কোন খাদ্যই তাঁর কাছে ছিল না। খোঁজ করে পানিও কোথাও তিনি পেলেন না। পিপাসায় তাঁর প্রাণ হয়েছিল ওষ্ঠাগত। এমন সময় তিনি অনুভব করলেন উপর থেকে তাঁর সম্মুখে একটি পানির পাত্র নামছে। তীব্র পিপাসার যাতণায় তিনি পরিতৃপ্তি সহকারে উক্ত পাত্র থেকে পানি পান করলেন। তাঁর পানি পানের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পর তিনি দেখলেন যে, পাত্রটি উপর দিকে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই পানি পান করার পর জীবনে তিনি পানির পিপাসায় কষ্ট পাননি। (ইবনে হাজার আশাকালানীঃ আল ইছাবা, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৪৩৩)। বিপদ সংকুল পথের সকল বাধা অতিক্রম করে হযরত বারাকা (রাঃ) মদীনায় পৌছেন। খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য দৌড়ে এলেন। উম্মে আয়মানের পদযুগল ছিল ক্ষত বিক্ষত এবং ফুলা। ধুলী বালিতে আচ্ছন্ন।

সাক্ষাতের সময় রাসূলুল্লাহ্র কণ্ঠে ছিল, "হে আমার মা! হে উম্মে আয়মান! অবশ্যই জান্নাতে আপনার স্থান নির্ধারিত হয়ে আছে।" রাসূল তাঁর মুখ এবং চোখের পানি মুছে দেন। তাঁর পা টিপেন, তাঁর ঘাড় ম্যাসেজ করে দেন। অত্যন্ত গভীর শ্রদ্ধা এবং বিনম্র ভাবে তিনি উম্মে আয়মানের সেবা করেন।

যায়দ ইবনে হারিসা

মক্কায় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) পরিবারে তিনি বিশেষ মর্যাদার সদস্য ছিলেন, যারা পরবর্তীতে বিশ্ব বিখ্যাত হয়েছিলেন। এরা হলেন– হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) ও রাসূলুল্লাহ্র পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারিছা (রাঃ) এবং বারাকা বিনতে সালাবা। পরিবারের অন্যতম সদস্যা ছিল বিবি খাদিজার প্রথম সংসারের কন্যা হিন্দ এবং পুত্র হারিস। পুরুষদের মধ্যে ইসলামের ইতিহাসে প্রথম শহীদ হলেন (আবু হালার) হযরত খাদীজার পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত পুত্র হারিস।

বালক যায়েদ ছিলেন ইয়েমেনের বনু কালবের সর্দার হারিছের পুত্র। দস্যু দল তাকে ধরে নিয়ে দাস ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করে দেয়।

www.nagorikpathagar.org

আরবের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য নগরী মক্কায় ছিল রমরমা দাস ক্রয় বিক্রয় কেন্দ্র। খাদিজার ভ্রাতুষ্পুত্র হাকিম ইবন হাজাম যায়েদকে ক্রয় করে ফুফু খাদিজাকে প্রদান করে। মহিয়সী মহিলা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ্‌র সঙ্গে তার বিয়ের পর উপহার হিসেবে যায়েদকে অর্পন করেন রাসূলুল্লাহর হাতে।

বর্তমানে বিয়ের পর বর-কনেকে বিভিন্ন দ্রব্যাদি উপহার দেয়া হয়। তৎকালে উপহার দ্রব্যের মধ্যে ছিল দাস দাসী। রেডিও, টিভি, গাড়ী যেমন বিবাহের উপহার সামগ্রী হিসেবে গণ্য হয়, দাস দাসীও সেরূপ উপহারীয়, দ্রব্য হিসেবে গণ্য হত।

রাসূলুল্লাহ্‌র পিতা আব্দুল্লাহ্‌র (রাঃ) বিবি আমিনার সাথে বিয়ের কথাবার্তা চূড়ান্ত হওয়ার পর মক্কার দাস বাজার থেকে বালিকা বারাকাহকে ক্রয় করেছিলেন। নব বিবাহিত হবু স্ত্রী আমিনাকে তাঁর (আমিনার) খিদমতের জন্য উপহার হিসেবে প্রদানের উদ্দেশ্যেই বারাকাহকে ক্রয় করা হয়েছিল।

যায়েদকে ফেরৎ নেয়ার জন্য তাঁর পিতা ও পিতৃব্য মক্কায় এসেছিলেন। কিন্তু যায়েদ খাদিজা এবং ইবনে আব্দুল্লাহ্‌র প্রতি এত অনুরক্ত হয়েছিলেন যে, নিজ পিতামাতার নিকট পর্যন্ত ফিরে যেতে চান নি। মানব ইতিহাসে এরূপ ঘটনা বিরল।

নবুয়্যতের পর যারা ইসলাম কবুল করেছিলেন তাদের মধ্যে প্রাথমিক দু'জন ছিলেন– বারাকাহ এবং যায়েদ।

হযরত খাদিজার পরেই খুব সম্ভব তাঁরা ইসলাম কবুল করেছিলেন। প্রাথমিক মুসলিমদের প্রতি যে অত্যাচার এবং নির্যাতন করা হয়েছিল বারাকাহ এবং যায়িদ তাদের প্রাপ্য পুরু হিস্যাও পেয়েছিলেন।

হযরত যায়িদের কাজ ছিল ইসলামের দুশমনদের ষড়যন্ত্র এবং নব উদ্ভাভিত নির্যাতনের লক্ষ্য এবং প্রণালীর তথ্য সংগ্রহ করা। এ জন্য তাকেও বিলাল, খাব্বাব, প্রমূখের ন্যায় মর্মান্তিক না হলেও অনুরূপ নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল।

হযরত যায়েদ এর সঙ্গে বিবাহ

কোনো এক সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীদেরকে বললেন, "যদি কেউ একজন জান্নাতী নারী বিয়ে করতে চায়, সে উম্মে আইমানকে বিয়ে করতে পারে। উম্মে আইমান ছিলেন তখন বৃদ্ধা। ক্ষীন স্বাস্থ্যবর্তী, কৃষ্ণকায়া এবং সুদর্শনাও নয়।

উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে যায়েদ ইবনে হারিছা এগিয়ে এসে বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমি উম্মে আয়মানকে বিয়ে করতে চাই। সে সৌন্দর্য ও সুষমা মন্ডিত নারীদের থেকে উত্তম।"

www.nagorikpathagar.org

মুক্তি প্রাপ্ত ক্রীতদাস সাহাবী যায়েদ এবং মুক্তি প্রাপ্ত ক্রীতদাসী সাহাবীয়া উম্মে আয়মানের শাদী মোবারক রাসূলুল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হল।

বারাকাহ এবং যায়েদ এর সংসারে জন্ম গ্রহণ করল আরেকজন শ্রেষ্ঠ সাহাবী উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)। তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। রাসূল (সাঃ) উসামাকে কোলে নিতেন। চুমু দিতেন, তার সাথে দৌড়াদৌড়ি করতেন এবং তার নাক পরিষ্কার করে দিতেন এবং নিজ হাতে খাওয়াতেন। তার উপাধি ছিল রাসূলুল্লাহ্‌র প্রেমাস্পদ যায়েদ পুত্র প্রেমাস্পদ উসামা।

উসামার (রাঃ) তার বয়স যখন ১৮ এর কাছাকাছি তাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে জীবনের সর্বশেষ অভিযানের সেনাপতি নিয়োগ করেছিলেন। অভিযানটি ১১ই হিজরী রবিউল আউয়াল মাসে হয়েছিল। সিরিয়ার অন্তর্ভূক্ত ফিলিস্তিন অভিমুখে এ অভিযান প্রেরণ করেছিলেন।

মুতার যুদ্ধে উসামার পিতা এবং তাঁর পালক পুত্র সেনাপতি যায়েদ ইবনে হারিছাব শাহাদাৎ বরণ করেন। উসামা সৈন্যদলের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন (১) হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রাঃ) (২) হযরত উমর ফারুক (রাঃ) (৩) হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) (৪) হযরত সাঈদ বিন যায়িদ (রাঃ) (৫) হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) এবং (৬) হযরত কাতাদা ইবনে নোমানের (রাঃ) মতো বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, প্রবীন আনসার মহাজির সাহাবায় কেরাম। উপরে উল্লেখিত প্রথম পাঁচজন ছিলেন দুনিয়ায়ই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের মধ্য হতে পাঁচজন।

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) ইন্তেকাল করেন হযরত মুয়াবিয়ার খিলাফতকালে ৫৮ হিজরীতে মদীনায় তাকে দাফন করা হয়।

হযরত যায়েদ (রাঃ) সারাটি জীবন ছায়ার মত রাসূলুল্লাহ্‌কে অনুসরণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উম্মে আয়মানের গৃহে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। কখন কখন হযরত আবু বাকার এবং হযরত উমারকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। রাসূলুল্লাহ– জিজ্ঞাসা করতেন "হে উম্মি ! হে আমার মা ! আপনি কেমন আছেন"? উম্মে আয়মান (রাঃ) জবাবে বলতেন– "হে আল্লাহ্‌র রাসুল ! ইসলামের এবং মুসলমানদের অবস্থা যদি ভাল থাকে, আমিও ভাল থাকি"।

মদীনায় ও জিহাদে

মদীনায় উম্মে আয়মানের ভূমিকা লক্ষনীয় ছিল। উহুদ যুদ্ধের দুর্ভাগ্যের সময় তিনি আহতদের সেবা করেন। তৃষ্ণার্থ মুজাহিদদেরকে পানি পান করান। তিনি খায়বার এবং হুনায়নের অভিযান পর্যন্ত বহু যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্‌র সঙ্গী হয়েছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

তাঁর প্রথম বিবাহের একমাত্র সন্তান আয়মান (রাঃ) অষ্টম হিজরীতে হুনায়নের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তার স্বামী যায়েদ (রাঃ) তো মুতার বিখ্যাত যুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন এবং সে যুদ্ধেই শাহাদাত বরণ করেন।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে উম্মে আয়মানের কাজ হত সৈন্যদেরকে পানি পান করানো এবং আহতদের চিকিৎসা করানো। (ইবনে সা'দ ঃ আত তাবাকাতুল কুবরা; ৮ম খন্ড; পৃঃ ৫৮)।

হযরত উম্মে আয়মান যুদ্ধে বিপর্যয়ের সময় মুসলিম সৈন্যদেরকে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করতেন।

তাকে দেখেই মুজাহিদদের মন পিতামহীকে দেখার আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠত। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ তাকে উম্মী বা 'আমার মা' বলে সম্বোধন করতেন। রসূলের মায়ের হাতে সেবা অপেক্ষা তৃপ্তিকর সেবা আর কীই বা হতে পারে।

উচ্চারণ বৈকল্য

হাবশীদের পক্ষে আরবী সঠিকভাবে উচ্চারণ করা কঠিন হত। হযরত বিলালের মুখেও জড়তার কারণে আযানের কয়েকটি শব্দ ভিন্নরূপ শুনাত। হযরত উম্মে আয়মান (রাঃ) "আসসালামু আলাইকুম" ঠিক মত উচ্চারণ করতে পারতেন না। তিনি আসসালামু আলাইকুম এর পরিবর্তে "সালামুন লা আলায়কুম" বলে ফেলতেন। এতে অর্থ হত তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত না হোক। এরূপ বিকৃত অর্থ হলেও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিব্রর হতেন না। যদিও সালামটি অভিশাপের মত হত। কিন্তু অন্যদের কানে তা খুবই খারাপ শুনাত। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে শুধুমাত্র আসসালাম বলার অনুমতি দিয়েছিলেন (ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ পৃঃ ৫৮)।

আরবী সাবাতা শব্দের অর্থ হলো পদ দৃঢ় রাখা। কিন্তু তিনি বলে ফেলতেন সাব্বাতা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন তাকে অনুরোধ করে বলেন - আপনার উচ্চারণ করতে কষ্ট হয়। কারণ আপনার জিহ্বায় জড়তা আছে। তাই কষ্টকর শব্দ উচ্চারণ না করে চুপ থাকবেন। (ইবন সাদঃ আত-তাবাকাত)।

রাসূলের কৌতুক

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উটের বাচ্চা সংক্রান্ত কৌতুকটি হযরত উম্মে আয়মানকে কেন্দ্র করে। বয়স হয়ে যাওয়ার পর চলা ফেরার জন্য হযরত বারাকাহ (রাঃ) রাসূলের নিকট ভারবাহী একটি উট চেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কৌতুক করে বলেন–আপনাকে আমি একটি উটের বাচ্চা দিব। হযরত বারাকাহ্ বলেন – উটের

www.nagorikpathagar.org

বাচ্চা নিয়ে আমি কি করব ! এটা তো আমাকে বহন করতে পারবে না।

রাসূলুিল্লাহ্ (সাঃ) বললেন – উটের বাচ্চার উপরেই আপনাকে আরোহণ করাব। অবশ্য পরে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, সকল উটই তো এক সময় ছিল আরেকটি উটের বাচ্চা।

হাদীস বর্ণনা

উম্মে আয়মান বারাকাহ (রাঃ) জ্ঞানী হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন এবং এই হাদীস নির্ভরযোগ্য হিসেবে গণ্য হত।

কি পরিমাণ সম্পদ চুরির জন্য হাত কাটা সঙ্গত হবে। এ বিষয়ে তাঁর বর্ণিত হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসুল (সাঃ) বলেছেন - "যুদ্ধের একটি ঢালের মূল্যের জিনিস চুরি করা হলে হাত কাটা যাবে"।

হযরত আলী (রাঃ) হযরত ফাতেমার সঙ্গে তাঁর বিবাহের মুহরানা দেয়ার জন্য নিজের ঢালটি বিক্রয় করে পেয়েছিলেন ৪০০ দিরহাম। ক্রেতা ছিলেন হযরত উসমান (রাঃ)।

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, উম্মু আয়মান বলেন একবার রাসূল (সাঃ) আমাকে মসজিদুন নব্বী হতে একটি চাটাই আনতে বলেন। আমি তখন ঋতুবতী ছিলাম। তাই বললাম – আমি তো ঋতুবতী। প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ বললেন আপনার হাতে তো অপবিত্রতা নেই। (তাবরানী ঃ সূত্র - আবু যায়দ আল- মাদানী)।

রাসূলের ইন্তেকাল

রাসূলের ইন্তেকালে তিনি এত মর্মাহত হয়েছিলেন যে প্রায় সময়ই তিনি কাঁদতেন। রাসূলুল্লাহ্র ইন্তেকালে বারাকাহ এত অধিক অশ্রুপাত করতেন যে, তা যে কোন ব্যক্তিকে অভিভূত করত। তাঁর অশ্রুজলের প্রভাব অন্যদের উপরে হত গভীর। অন্যরা তার হৃদয়ের ব্যথা অনুভব করতেন।

হযরত আবু বাকার (রাঃ) এবং হযরত উমার (রাঃ) তাকে সান্তনা দেয়ার জন্য তার গৃহে গমন করেন। তাকে শান্তনা দিয়ে বলেন – রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্বন্ধে আল্লাহ যা সিদ্ধান্ত করেছেন তাই তো উত্তম। সুতরাং এত কাঁদছেন কেন।

প্রত্যুত্তরে বারাকাহ (রাঃ) বলেন– আমি জানি মানুষ মরণশীল। রাসূলও মরবেন এবং রাসূল (সাঃ) ইন্তেকাল করেছেন। আমি এজন্য কাঁদছি যে এখন থেকে ওয়াহীর বরকত থেকে দুনিয়াবাসী মাহরূম হয়ে গেল।

www.nagorikpathagar.org

তাঁর বক্তব্য শুনে হযরত আবু বাকার (রাঃ) এবং উমর (রাঃ) দু'জনেই কান্না শুরু করে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ্‌র জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যারা রাসূলুল্লাহকে দেখেছেন তাদের মধ্যে একজন হলেন বারাকাহ (রাঃ)। এ সৌভাগ্য আর কারও হয়েছিল কিনা সন্দেহ। তাঁর জীবন ছিল রাসূলুল্লাহ্‌ এবং তাঁর পরিবারের জন্য উৎসর্গকৃত।

রাসূলুল্লাহ্‌র তাকে কাজের মেয়েলোক বা খাদিমা হিসেবে দেখেন নি। বরং (সাঃ), তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলেন সারা জীবন মাতৃ-স্নেহের পরশ। একমাত্র তার কাছেই আমার মা, আমার মা, বলে ছুটে যেতেন। শুধু ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সাঃ) নয় বরং - রাসূলুল্লাহ্‌র আদর্শের প্রতি বারাকাহ, যায়েদ, উসামা (সাঃ) ছিল বিশুদ্ধ চিত্তে অনুগত ও স্থির লক্ষ্য।

মৃত্যু

হযরত উমারের শাহাদতের খবর পেয়ে উম্মে আয়মান (রাঃ) যে মন্তব্য করেছিলেন তা ছিল গভীর অর্থবহ। বারাকার তাৎক্ষণিক বক্তব্য ছিল- আজ ইসলাম শহীদ হয়ে গেল। হযরত উমারের শাহাদাতে ২০ দিন পর উম্মু আয়মান বারাকাহ ইন্তেকাল করেন। ভিন্নমত হল হযরত উমরের শাহাদাতের ৫-৬ মাস পর হযরত বারাকাহ (রাঃ) ইন্তেকাল করেন। (ইবনুল আছীর আল জাহারী; উসদুল গাবা; পঞ্চম খন্ড)।

হযরত বারাকাহ (রাঃ) উম্মে আয়মানের পিতৃভূমি ও জন্মস্থান অনিশ্চিত। মৃত্যু পরবর্তী জীবনে তাঁর স্থান যে সুনিশ্চিত ফেরদাউস-তা আল্লাহ্‌র রাসূল বার বার প্রত্যয়ন করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রাঃ)

রাসূলুল্লাহ্‌র আযাদকৃত দাস এবং পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারিসা ছিলেন এক অনন্য সাধারণ মহান ব্যক্তিত্ব। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম ছিলেন উম্মুল মুমিনিন খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রাঃ) এবং প্রথম শহীদ ছিলেন সুমাইয়া বিনতে খাবাত (রাঃ)।

পুরুষদের মধ্যে প্রথম শহীদ ছিলেন উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদীজার প্রথম স্বামী আবু হালা এর ঔরষজাত পুত্র হারিস (রাঃ)। পুরুষদের মধ্যে প্রথম মুসলিম কে ছিলেন এ সম্পর্কে সর্বাধিক গৃহীত অভিমত হল হযরত আবু বাকার (রাঃ)।

এ বিষয়ে কোন তথ্য রাখার প্রয়োজন সেকালে অনুভূত হয়নি। কার কার মতে প্রথম পুরুষ মুসলিম ছিলেন রাসূলুল্লাহ্‌র আযাদকৃত দাস ও পালক পুত্র যায়েদ বিন হারিসা (রাঃ)। এটা অবিশ্বাস্য মনে হয় না বরং অনেকের মতে অধিকতর সম্ভাব্য। কার কার মতে হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন পুরুষদের মধ্যে প্রথম।

কে ছিলেন এ ক্রীতদাস যায়েদ ইবনে হারিসা (রাঃ)? অন্যান্য বহু ক্রীতদাস থেকে তাঁর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। কম বয়েসী ক্রীতদাসেরা কর্মক্ষম থাকে। তাই তাদের বাজার দর হয় বেশি। আট বছরের ক্রীতদাস বালক-বালিকাদের অনেকের পক্ষে দাদা-দাদীর নাম মনে রাখাও কষ্টকর। কোন কোন ক্রীতদাস যেমন সাহাবী জুলাইবিব– পিতা-মাতার নামটিও সঠিকভাবে স্মরণ রাখতে পারেন নি।

বংশ পরিচয়

এ ক্ষেত্রে যায়েদ ইবনে হারিসা (রাঃ) ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি যখন লুণ্ঠিত হয়ে ক্রীতদাস হিসেবে মক্কার উকায দাস বাজারে বিক্রয় হন, তখন তাঁর বয়স ছিল ৮ বছর। পরবর্তী সময়ে তাঁর পিতা এবং পিতৃব্য তাকে মক্কায় আবিষ্কার করেন। যার ফলে তার পূর্ব পুরুষদের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

হযরত যায়েদ ইবনে হারিছার দাস হিসেবে ক্রেতা ছিলেন হাকিম ইবনে হিজাম। তিনি ছিলেন উম্মুল মুমিনিন খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ এর ভ্রাতা হিজাম এর পুত্র। তাঁর বিক্রয় মূল্য ছিল সে সময় ৪০০ দিরহাম এবং বিক্রেতা ছিল বানু কায়েস ক্বিবিলার লুটেরাগণ। তারা বিক্রেতা না হলেও লুটেরা যে ছিল এটা অনেকটা নিশ্চিত।

www.nagorikpathagar.org

হযরত যায়েদ ইয়ামেনের বানু ক্বালব গোত্রের কুদাআ শাখার একটি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ক্ববিলার একজন সম্পদশালী ব্যক্তি। যায়েদের মাতা একটি কাফেলার সঙ্গে পিত্রালয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ঐ কাফেলাটি বানু কায়েসের সন্ত্রাসী লুটেরাদের আক্রমণের শিকার হয়।

মাতা যায়েদকে চাদরে ঢেকে বুকের কাছে জড়িয়ে রেখেছিলেন। কেউ ৮ বছরের বালককে বুকে ধরে গায়ে চাদর জড়াল তাকে স্বাভাবিক ভাবেই মোটা মনে হয়। লুটেরারা মনে করেছিল যায়েদের মা হয়তো দামী সম্পদ চাদরের নিচে লুকিয়ে রেখেছে। লুকানো বিষয় সম্পদের চেয়ে অমূল্য ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। এ সম্পদ ছিল সুদর্শন বালক যায়েদ। শিশু গোলাম হিসেবে যার বিক্রয় মূল্য হতে পারে মক্কার দাস বাজারে প্রচুর।

হারানো যায়েদকে আবিষ্কার

কয়েক বছর পরের ঘটনা। ইয়েমেনের ক্বালব গোত্রের কিছু লোক হাজ্জ উপলক্ষ্যে মক্কায় আসে। ঘটনাক্রমে তাদের সঙ্গে যায়েদের সাক্ষাৎ হয়। তারা যায়েদকে চিনতে পারে এবং যায়েদ (রাঃ) তাদেরকে চিনতে পারে। তারা যায়েদকে অবহিত করেন যে, যায়েদের পিতামাতা তার বিয়োগ ব্যথায় অত্যন্ত কাতর। এ জন্য তারা শোকগাথা রচনা করেন। এ শোকগাথাগুলো কিছু কিছু সংরক্ষিত হয়েছে এবং সংকলিত হয়েছে।

খবর শুনে যায়েদ বিন হারিছাও কবিতা রচনা করে তাদের (হজ্জ যাত্রীদের) মাধ্যমে তার পিতার নিকট প্রেরণ করেন। একটি আরবী কবিতার কিছু অংশ উদাহরণ স্বরূপ ইসলামী বিশ্বকোষে উদৃত হয়েছে। তরজমা নিম্নরূপঃ

আমি আমার কাওমের প্রতি আসক্ত যদিও আমি দূরে রয়েছি।
আমি বায়তুল্লাহ্‌র মাশআর-ই হারাম এ থাকি।
তোমরা দুঃখ হতে বিরত থাক, যা তোমাদেরকে মর্মাহত করে রেখেছে।
উটের মত চলাফেরা করে আমার সন্ধানে বিশ্ব চষিয়া বেড়িও না।
কারণ আলহামদুলিল্লাহ – আমি একটি উত্তম ও অভিজাত পরিবারের নিকট আছি।
যারা বহু পুরুষ পরম্পরায় অভিজাত ও সম্মানী।

(ইবনুল আছীর, উসুদুল গাবা; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২২৪-২২৫, ইবনে সা'দ তাবাকাত, তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ৪১)। ইসাবা; প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৩৬)

বনু কালবের লোকজন যায়েদের এ কবিতা ও যায়েদ সংক্রান্ত সকল তথ্য তাঁর পিতার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়।

www.nagorikpathagar.org

ক্রয় মূল্য দিয়ে যায়েদকে ফেরত পাওয়ার প্রস্তাব

খবর এবং কবিতা পেয়ে হারিছা আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করে উঠে এবং জিজ্ঞাসা করে– কাবার রব্বের কসম ! এটা কী আমার পুত্রের প্রেরিত ? সত্যিই কি সে আমার পুত্র ? হজ্জ যাত্রীদের থেকে যতটুকু সম্ভব খবর নিয়ে হারিছা স্বীয় ভ্রাতা ক্বাব ইবনে শারাহিলকে নিয়ে মক্কার পথে রওয়ানা হন। আর সঙ্গে নিয়েছিলেন প্রচুর অর্থ যাতে মালিকের নিকট হতে যায়েদকে পুনঃ ক্রয় করা সম্ভব হয়।

তারা মক্কা এসে খাজিদা (রাঃ) এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) তার পরিবারের খবর নিলেন। তাদের সন্ধান পেয়ে জানতে পারলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কাবা চত্তরে আছেন। সেখানেই তারা মুহাম্মাদের (সাঃ) সাক্ষাৎ পেলেন। যায়েদ (রাঃ) সম্পর্কে তথ্য বিনিময়ের পর অত্যন্ত বিনম্রভাবে কুরাইশদের প্রশংসা করে বিনিময় মূল্য গ্রহণ করে যায়েদকে ফেরৎ নেয়ার প্রস্তাব করেন তারা।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সব কিছু শুনে অভিমত প্রকাশ করেন যে, যায়েদকে ফেরৎ দিতে কোন বিনিময় মূল্যই গ্রহণ করা হবে না। তিনি বলেন যায়েদ যদি পিতামাতার নিকট ফেরত যেতে চায়, তবে তো সে আপনাদেরই। আর সে যদি আমাদের কাছে থাকতে চায়, তবে আল্লাহ্‌র কসম ! আমি এমন নই যে, তাকে অন্যের নিকট হস্তান্তর করব। বিষয়টি তিনি যায়েদের উপর ছেড়ে দিতে বললেন।

যায়েদের প্রতিক্রিয়া

যায়েদের পিতা হারিছা এবং তাঁর ভ্রাতা ক্বাব ইবন শারাহিল অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। যায়েদকে সেখানে ডাকানো হল।

হারিছা এবং ক্বাবকে দেখিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এদেরকে চিন ? অভিভূত যায়েদ (রাঃ) অপরিসীম আনন্দের সঙ্গে পিতাকে জড়িয়ে ধরে বললেন –আমার পিতা এবং ক্বাবকে দেখিয়ে বললেন আমার পিতৃব্য। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যায়েদকে জানালেন যে, তারা তাকে ফেরৎ নিতে এসেছে। তারপর যায়েদকে বললেন – আমাকে তুমি জান এবং তোমার প্রতি আমার অনুভূতি সম্পর্কেও তুমি অবহিত। এখন তুমি আমাকে অথবা তাদেরকে তোমার ইচ্ছানুসারে গ্রহণ করতে পার।

আবেগাপ্লুত যায়েদ (রাঃ) এত কাল পরে পিতাকে দেখে ছিল অশ্রু সজল। রাসুলুল্লাহ্‌র কথা শুনে তাঁর দু'নয়ন থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হল।

যায়েদ রাসূলুল্লাহকে সম্বোধন করে বললেন– আপনি আমার পিতামাতা। আপনাকে ত্যাগ করে আমি এ পৃথিবীতে আর কাউকে গ্রহণ করব না। যায়েদের

www.nagorikpathagar.org

কথা শুনে যায়েদের পিতা ও পতিৃব্য আশ্চর্য হল এবং ক্ষেপে গেল। তাকে তিরস্কার করে বলল– তুমি পিতা, পিতৃব্য, পরিবার-পরিজন চাওনা ? মুক্তি চাওনা? তুমি দাসত্ব চাও ? তুমি কুলাঙ্গার।

যায়েদ (রাঃ) দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ' আমি সব কিছুই। তবে আমি এ মহান ব্যক্তির মধ্যে এমন কিছু দেখেছি যে তাকে ত্যাগ করে জীবনে কখন আর কাউকে গ্রহণ করব না। যায়েদের কণ্ঠ ধ্বনিতে মুগ্ধ হয়ে রাসূলুল্লাহ্ যায়েদকে বুকে চেপে ধরলেন এবং ঘোষণা করলেন – হে উপস্থিত লোক সকল ! তোমরা সকলে স্বাক্ষী থেক, যায়েদ আমার পুত্র। আমি তার ওয়ারিশ, সে আমার ওয়ারিশ।

এ দৃশ্য দেখে যায়েদের পিতা হারিছা ও পিতৃব্য ক্বাব হৃষ্ট চিত্তে ইয়েমেনে ফিরে গেলেন। সেদিন থেকে যায়েদের নাম হল যায়েদ ইবনে মুহাম্মাদ।

অতঃপর যখন কুরআনের আয়াত নাযিল হল – মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং শেষ নবী। আরও নাযিল হল – তোমরা তাদেরকে স্বীয় পিতৃ পরিচয়ে ডাক। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তা অধিক ন্যায় সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জান তবে, ওরা তোমাদের ধর্মীয় ভ্রাতা এবং বন্ধু (সূরা আহযাব; ৩৩ঃ৫)। যায়েদ (রাঃ) পুনঃ পরিচিত হলেন যায়েদ ইবনে হারিছা নামে।

মদীনায় হযরত যায়েদের দ্বীনি ভাই নিযুক্ত হন আনসার নেতা উসায়েদ বিন জাফর (রাঃ)। মক্কায় তাঁর দ্বীনি ভাই ছিলেন রাসূলুল্লাহর পিতৃব্য এবং আব্দুল মোত্তালিবের পুত্র হামযা (রাঃ)।

মুজাহিদ যায়েদ (রাঃ)

যায়েদ (রাঃ) ছিলেন একজন বিচক্ষণ বীর যোদ্ধা। তীরন্দাজীতে তিনি ছিলেন মুসলিমদের মধ্যে সর্বাধিক অভিজ্ঞ। অথচ মুতার যুদ্ধে বক্ষে আকস্মিক তীর বিদ্ধ হয়েই তিনি ৫৫ বছর বয়সে শাহাদাত বরণ করেন।

বদর যুদ্ধ থেকে মুতার যুদ্ধ পর্যন্ত মুরাইসী যুদ্ধ ব্যতিত সকল যুদ্ধেই যায়েদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্র অনুসঙ্গী হয়েছিলেন। মুরাইসী যুদ্ধকালে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে মদীনায় নিজের প্রতিনিধি নিয়োগ করে যান। বড় বড় যুদ্ধ ছাড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু জেহাদে যায়েদ (রাঃ) নেতৃত্ব প্রদান করেছেন।

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রাঃ) বলেছেন –যায়েদ (রাঃ) যে অভিযানে শরীক হত সে অভিযানের – নেতৃত্ব তাঁর উপরেই পড়ত। নয়টি যিহাদে তিনি সেনাপতিত্ব করেন।

www.nagorikpathagar.org

হযরত যায়েদের নেতৃত্বাধীন সর্ব প্রথম অভিযান ছিল সারিয়া কারাদা। এ অভিযানে তিনি প্রতিপক্ষকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। বন্দীদের মধ্যে ছিল- ফুরাত ইবনে হায়্যান নামক একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। (ইবনে হিশাম ঃ আস-সীরাত, তৃতীয় খন্ড পৃঃ ১১-২২)।

বানু সুলায়মান গোত্রকে দমন করার জন্য যামুম নামক স্থানে অভিযান প্রেরিত হয় ৬ষ্ঠ হিজরীর রাবিউস সানী মাসে। তাতেও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যায়েদ ইবনে হারিছা (রাঃ)। উক্ত যুদ্ধে মুসলিমগণ অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেন। (সিয়ারুস সাহাবা; দ্বিতীয় খন্ড; পৃঃ ২২৯)।

সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকারী একটি কুরাইশ কাফেলাকে প্রতিরোধ করার জন্য ৬ষ্ঠ হিজরীতে ১৭০ জন অশ্বারোহীসহ হযরত যায়েদ (রাঃ) এর নেতৃত্বে একটি অভিযান প্রেরণ করা হয়। "ঈস" নামক স্থানে উক্ত কাফেলার যাত্রীদেরকে সকল মালামালসহ গ্রেপ্তার করে হযরত যায়েদ (রাঃ) মদীনায় নিয়ে আসেন।

তারাফ নামক স্থানে ৬ষ্ঠ হিজরীতে হযরত যায়েদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় একটি অভিযান। শত্রু পক্ষ ভীত হয়ে পলায়ন করে। এতে কোন যুদ্ধই সংগঠিত হয়নি।

হিমশা অভিযান

হযরত যায়েদের নেতৃত্বে হিমশা অভিযানটি ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। এ অভিযানে মুজাহিদদের সংখ্যা ৫০০০। সাহাবী দিহয়া আল কালবি এর নেতৃত্বে মুসলিমগণ কনস্টানটিনোপল হতে প্রত্যাবর্তন কালে শত্রু পক্ষ মুসলিমদের উপর আক্রমণ চালায়। তাদেরকে শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে ৫০০০ সৈন্যের এ বাহিনী হযরত যায়েদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এ অভিযান কালে তিনি রাতের বেলা চলতেন আর দিনের বেলা পাহাড়ের অন্তরালে লুকিয়ে থাকতেন।

৫০০০ লোকের বাহিনী মাল-পত্র, অস্ত্র- সম্ভারসহ দ্রুত চলা কষ্টকর। তদুপরি এত বড় বাহিনী পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাতে শত্রু পক্ষ সাবধান হয়ে যায়। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এ অভিযান পরিচালিত করতে হয়েছিল। অতর্কিত আক্রমণ করে হযরত যায়েদ শত্রু পক্ষকে পরাভূত করেন।

তাদের ১০০ উট, ৫০০০ বকরী ও লোকজনকে গ্রেপ্তার করে ইবনে রিফায়ার নেতৃত্বে মদীনায় পাঠিয়ে দেয়া হয়।

একই সালে (৬ষ্ঠ হিজরী) রজব মাসে ওয়াদী আল কুরআয় অভিযান প্রেরিত হয় হযরত যায়েদের নেতৃত্বে।

www.nagorikpathagar.org

৬ষ্ঠ হিজরীতে রমজান মাসে হযরত যায়েদের নেতৃত্বে মুসলিমদের একটি বাণিজ্য কাফেলা শ্যাম দেশে প্রেরিত হয়। ওয়াদী আল- কুরআন নিকট পৌঁছলে বনু বাদর গোত্রের দস্যু দল মুসলিম কাফেলার উপর আক্রমণ করে জিনিসপত্র লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। কাফেলার আমীর যায়েদ বিন হারিছা (রাঃ) কোন রকম প্রাণ রক্ষা করে মদীনায় ফিরে আসেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অতঃপর যায়েদ বিন হারিছার নেতৃত্বে এই সারিয়াহ্ অভিযান প্রেরণ করেন। বানু বাদর গোত্রদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে হযরত যায়েদ (রাঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। (সিয়ারুস সাহাবা; ২য় খন্ড; পৃঃ- ২৩০-২৩১)।

মূতার যুদ্ধ

যায়েদ ইবনে হারিছার সৈনিক জীবনের সর্ব প্রধান কৃতিত্ব হল মূতার যুদ্ধ। এ যুদ্ধ সংগঠিত হয় ৮ম হিজরীর জুমাদাল উলাম মাসে।

অষ্টম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিভিন্ন দেশের রাজা বাদশাহদের নিকট ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত নিয়ে দূত প্রেরণ করেন। সিরিয়ার রোমান গভর্ণর শুরাহবিল ইবন আমর গাসসানী রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রেরীত দূত হারিস ইবন উমায়েরকে হত্যা করে। এর প্রতিবিধানে অনুষ্ঠিত হয় মূতার যুদ্ধ। এ যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি ছিলেন যায়েদ বিন হারিছা (রাঃ)। এ যুদ্ধে যায়েদ বিন হারিছা (রাঃ) মাত্র ৩০০০ মুজাহিদ নিয়ে ২৫,০০০ রোমক বাহিনীর মোকাবিলা করেন। শত্রু পক্ষের আকস্মিক একটি তীরাঘাতে তিনি শাহাদাৎ বরণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছিলেন- সর্ব প্রথম সেনাপতি যায়েদ ইবনে হারিছা (রাঃ) শাহাদাত বরণ করলে সেনাপতিত্ব করবেন জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ)। জাফর ইবনে আবি তালিব শহীদ হলে সেনাপতি হবেন আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)। তিনজন শাহাদাতের পর সৈন্যগণ নিজেরা সেনাপতি নির্বাচন করবেন। এ যুদ্ধে তিনজন সেনাপতিসহ মোট ১২ জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০ খন্ড পৃঃ ১)।

প্রথম তিনজন শাহাদাত বরণ করার পর মুজাহিদগণ হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে সেনাপতি নির্বাচন করেন। খালিদ বিন ওয়ালিদের হাতে এ যুদ্ধে ৭টি তরবারী ভেঙ্গে যায়। তিনি এমন বীর বিক্রম ও আন্তরিকতার সাথে তরবারী চালনা করেন যে, শুধু অশ্বারোহী নয়, অশ্ব পর্যন্ত টুকরো হয়ে যেত। এরূপ অসম যুদ্ধে বিজয় ছিল অসম্ভব।

www.nagorikpathagar.org

রোমানদের ক্ষতি এত বেশি হয়েছিল যে, তারা পশ্চাদাপসারণ করে। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের ইচ্ছাও ছিল তাই। তবে তাঁর কৃতিত্ব হল– এ অসম যুদ্ধে মাত্র ১২ জন মুসলিম শাহাদাত বরণ করেছে। কিন্তু একজনও রোমকদের হাতে বন্দী হয়নি।

হযরত যায়েদ (রাঃ) এর শাহাদাতের খবর আসার পর রাসুলল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। অতঃপর সাহাবী সমভিব্যাহে তিনি তার পরিবার-পরিজনের নিকট গমণ করেন।

রাসুলের সম্মুখেই হযরত যায়েদের এক কন্যা কেঁদে উঠল। মৃত্যুর কারণে সাধারণত রোদন করার বিধি নেই। কারণ মানুষ আল্লাহর কাছ থেকে আসে এবং আল্লাহর কাছে ফিরে যায়।

যায়েদের কন্যার কান্না দেখে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খুব কাঁদলেন। রাসূলুল্লাহর কান্না দেখে সা'দ ইবনে উবাদা বললেন– ইয়া রাসূলুল্লাহ্ এটা কী? রাসুল (সাঃ) বললেন, "এটা বন্ধুর জন্য বন্ধুর ভালবাসা। (সিয়ারু আলামীন মুবালা ঃ প্রথম খন্ড ; পৃ-২২৯-২৩০)।

হযরত যায়েদের মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছিলেন খুবই মর্মাহত। এ যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে পরবর্তী সেনাদল পাঠানো হয়– হযরত যায়েদ বিন উসামার নেতৃত্বে। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৮ বছরের কম।

রাসূলুল্লাহ (রাঃ) নিজেই বলেছেন - যায়েদ এবং উসামা ছিলেন তাঁর প্রিয় পাত্র। তাঁর প্রিয় পাত্রকে শুধু যে তিনিই ভালবাসতেন তা নয়, সাহাবীগণও ভালবাসতেন এবং সম্মান করতেন।

হযরত উমরের খিলাফত কালে বায়তুল মালের অর্থ নাগরিকদের মধ্যে বিতরণ করা হত। বিতরনের পরিমাণের একটি ভিত্তি ছিল রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সঙ্গে সম্পর্ক।

হযরত আয়েশা (রাঃ) এর ভাতা ছিল সবচেয়ে বেশি। তিনি যে বার্ষিক ভাতা পেতেন, তা পাওয়ার দিনই দান করে ফেলতেন। উসামা বিন যায়েদের ভাতা ছিল খলিফা পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বেশি।

উসামার পিতা যায়েদ (রাঃ)-ও রাসূলুল্লাহর নিকট তোমার পিতা উমর অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় পাত্র ছিল। (সিয়ারু আলামীন, মুবালা ; প্রথম খন্ড ঃ পৃঃ ২২৮)

www.nagorikpathagar.org

যায়েদ (রাঃ) এর বৈবাহিক জীবন

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) তিন পুত্রের জনক ছিলেন। তারা হলেন (১) কাশেম (২) আব্দুল্লাহ এবং (৩) ইব্রাহীম। তিনজনই অল্প বয়সে ইন্তেকাল করেন।

হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রাঃ) এবং তৎপুত্র উসামাকে প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তাঁর পুত্র এবং পৌত্রসম ভালোবাসতেন। এ জন্যে হযরত যায়েদ (রাঃ) হুব্বুর রাসূল অর্থাৎ রাসূলের প্রিয় পাত্র উপনামে ভূষিত হন।

হযরত যায়েদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্‌র স্নেহ ভালোবাসার গভীরতার একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বর্ণনা করেছেন হযরত আয়েশা (রাঃ)।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) এর বহু অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি ছিল লজ্জাশীলতা। যদিও পুরুষের ছতর হল–নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। রাসুল (সাঃ) -এর পৃষ্ঠ মুবারক দু'চারজন বা দু'চার বারের বেশি কেউ দেখতে পাননি। তাঁর প্রিয় পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন যে–তিনি শুধু একবারই এক বিশেষ কারণে রাসূলুল্লাহর পৃষ্ঠদেশ দেখতে পেয়েছিলেন।

মদীনার বাইরে দূরের এক সফর শেষে হযরত যায়েদ (রাঃ) ফিরে এসেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) হযরত আয়েশার কক্ষে শায়ীত এবং জাগ্রত ছিলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) দরজায় এসেই রাসূলুল্লাহকে বিধিমত সালাম জ্ঞাপন করেন। যায়েদের কণ্ঠস্বর শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এত দ্রুত শয্যা থেকে উঠে দরজার দিকে দৌড়ে গেলেন যে, তিনি চাদরটি পিঠে মোড়ানোর অবকাশ পাননি।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাধারণত নিত্য ব্যবহৃত চাদরটি গায়ের উপর ছড়িয়ে শুতেন। শয্যা থেকে উঠাকালে অথবা শয্যায় থেকেই চাদরটি পিঠে এবং সম্মুখে যথাযথভাবে জড়িয়ে নিতেন।

যায়েদের কণ্ঠস্বর শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) দ্রুত দরজার দিকে যান এবং দরজায় পৌছে দরজার ভিতর দিকে দাঁড়িয়ে চাদরটি পিঠে জড়ালেন। এই সুযোগেই বিবি আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্‌র পৃষ্ঠদেশ জীবনে একবার দেখার সুযোগ পান।

ঘটনাটি অতি ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্র ঘটনার আড়ালে যায়েদের প্রতি রাসূল (সাঃ) এর অনুভূতির কিঞ্চিত ইশারা পাওয়া যায়।

www.nagorikpathagar.org

হযরত যায়েদ (রাঃ) এর বংশ মর্যাদা

হযরত যায়েদ (রাঃ) ছিলেন ইয়েমেনের অধিবাসী। রাসূলুল্লাহ্‌র ইয়েমেনী সাহাবীদের মধ্যে তিনি ছিলেন শীর্ষ স্থানীয়। যেমন – সালমান ফারসী ছিলেন ইরানীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়।

হযরত বিলাল ইবনে রাবাহ (রাঃ) শ্রেষ্ঠ ছিলেন আবিসিনীয়ানদের মধ্যে এবং সুহাইব আর রূমী ছিলেন সিরিয়ানদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। মদীনার আনসারদের শীর্ষে ছিলেন হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ)।

হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রাঃ) ছিলেন ইয়েমেনের একটি প্রখ্যাত গোত্রের সন্তান। হেজাজে কুরাইশদের যে স্থান, ইয়েমেনী গোত্রগুলোর মধ্যে হযরত যায়েদ (রাঃ) এর গোত্র বানু কালবের সেরূপ ছিল মর্যাদা।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত যায়েদকে আযাদকৃত দাস হিসেবে দেখতেন না, তাঁর দৃষ্টিতে হযরত যায়েদের মর্যাদা মক্কার কুরাইশ বংশীয় সাহাবীদের থেকে বিন্দুমাত্র কম ছিল বলে মনে হয় না। শুধু যে হযরত যায়েদই তার দৃষ্টিতে মর্যাদার আসনে ছিলেন তা নয়, যায়েদের ১৭ বছর বয়স্ক সন্তান উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) পরিচালিত বাহিনীতে হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত উমর (রাঃ) এবং আবু উবায়দার (রাঃ) ন্যায় ব্যক্তিত্বকে অন্তর্ভূক্ত করতে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোনরূপ দ্বিধাবোধ করেননি।

হযরত যায়েদ বিন হারিছার বংশ তালিকা হল নিম্নরূপঃ

হযরত যায়েদ (২) ইবনে হারিছা, (৩) ইবনে শারাহিল, (মতান্তরে সুরাহবিল) (৪) ইবনে ক্বাব (৫) ইবনে আব্দুল উযযা (৬) ইবনে ইমরুল কায়েস (৭) ইবনে আমীর (৮) ইবনে নোমান (৯) ইবনে আমীর (১০) ইবনে আব্দুল উদ্‌দ্ (১১) ইবনে আউফ (১২) ইবনে কিনানা (১৩) ইবনে বাকর (১৪) ইবনে আউফ (১৫) ইবনে উযরাহ (১৬) ইবনে যায়েদ আল লাস (১৭) ইবনে রুফায়দা (১৮) ইবনে ছাত্তার (১৯) ইবনে ক্বালব (২০) ইবনে ওয়াবরা (২১) ইবনে কালবী (২২) ইবনে সালাম (মতান্তরে তাগলাব) (২৩) ইবনে হুলওয়ান (২৪) ইবনে ইমরান (২৫) ইবনে ইলহাফ (২৬) ইবনে কুদআ (২৭) ইবনে মালিক (২৮) ইবনে আমর (২৯) ইবনে মুররাহ (৩০) ইবনে মালিক (৩১) ইবনে হিমআর (৩২) ইবনে শাবা (৩৩) ইবনে ইয়াশযুর (৩৪) ইবনে মারুব (৩৫) ইবনে কাহাতান। (ইসলামী বিশ্বকোষ ২১ খন্ড; পৃঃ ৫৪৪)। ভারতের মুঘল সম্রাটদের ৩৫ পুরুষের বংশ তালিকা ঐতিহাসিকগণ গবেষণা করেও বের করতে পারবেন না।

www.nagorikpathagar.org

যায়েদের মাতা সুদা বিনতে সালাবা ছিলেন অভিজাত বংশের মহিলা এবং তায়্যিব গোত্রের অন্তর্ভূক্ত। যায়েদ বিন হারিছার পরিবার এত অভিজাত ছিল যে, তারা তাদের বংশ তালিকা সম্বন্ধে মক্কার কুরাইশদের থেকেও ছিল অধিকতর সচেতন। অথচ অনেকের মতে গোলাম হওয়ার কারণে যয়নাব বিনতে জাহশের সঙ্গে তার বিবাহটা ভেঙ্গে গেল। এটা ভুল ধারণা।

যায়েদের বয়স

যায়েদের বয়স কত ছিল ? কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় যে, যায়েদের বয়স ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে ১০ বছরের কম। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ২৫ বছর বয়সে বিবি খাদিজাকে বিবাহ করেন। সে হিসেবে ঐ বিবাহের সময় যায়েদের বয়স হওয়ার কথা ১৫। মুতার যুদ্ধে হযরত যায়েদ (রাঃ) শহীদ হন। তখন তার বয়স ছিল ৫৫ বছর। মুতার যুদ্ধ হয় ৮ম হিজরীর ৯ই জুমাদাল উলা। ঐ সময় রাসূলুল্লাহর (সাঃ) বয়স ছিল ৬১ বছর।

অন্যান্য বর্ণনায় আছে তাদের বয়সের পার্থক্য হল ২০ বছর। আযজাহাবী, শিয়ারু আলামীন, মুবাল্লা, প্রথম খন্ড, পৃঃ ২২২) এই মত নির্ভরযোগ্য মনে হয় না।

যায়েদের প্রথম বিবাহ

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত যায়েদের জন্য একটি পৃথক বাড়ীর ব্যবস্থা করে দেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) বাড়ীর মালিক হলেন। এখন একজন বাড়ীর মালিকা প্রয়োজন।

মক্কার কুরাইশ দলপতি আবু মুয়াইদ এর পুত্র উকবার কন্যা উম্মে কুলসুম মদীনায় হিজরত করে এলেন। তিনি শুধু অভিজাতই নন বরং একজন উন্নত চরিত্রের মহিলা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্র পরামর্শক্রমে তিনি যায়েদ ইবনে হারিছার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ বিবাহের ফলে যায়েদ এবং উম্মে কুলসুমের একটি পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম হয়। পুত্রের নাম হলঃ - আয়েদ ইবনে যায়েদ এবং কন্যার নাম রুকাইয়া বিনতে যায়েদ। তারা অবশ্য বাল্যকালে ইন্তেকাল করেন। এ বিবাহ স্থায়ী হয়নি।

যায়েদের দ্বিতীয় স্ত্রী আবু লাহাব কন্যা দুররাহ

হযরত যাযেদ (রাঃ) তার প্রথম স্ত্রী উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা বিনতে আবি মুয়াইদকে তালাক দেন। অতঃপর হযরত যায়েদ ইবনে হারিছা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্র চাচাতো ভগ্নি দুররাহ বিনতে আবু লাহাবকে বিবাহ করেন। আবি লাহাব ছিলেন কুরাইশ দলপতি আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র এবং রাসূলুল্লাহ্র পিতৃব্য। এ বিবাহ ও স্থায়ী হয়নি।

www.nagorikpathagar.org

হযরত যায়েদের তৃতীয় স্ত্রী জুবায়ের ভগ্নী হিন্‌দ

অতঃপর হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রাঃ) হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়ামের (রাঃ) ভগ্নী হিন্‌দ বিনতুল আওয়ামকে বিবাহ্‌ করেন। হিন্দের পিতা আওয়াম এবং হযরত খাদীজা ছিলেন ভ্রাতা-ভগ্নি। এ সম্পর্কে হযরত যায়েদ হলেন উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদিজার ভ্রাতুষ্পুত্রী জামাতা। হযরত যুবায়ের (রাঃ) ছিলেন আশারে মোবাশ্‌শারার ১০ জন সাহাবীর একজন। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র রাসূলের ভায়রা ভাই। অর্থাৎ বিবি আয়েশার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী আসমা বিনতে আবু বাকারের স্বামী। হযরত যায়েদের এ বিবাহও স্থায়ী হয়নি। হযরত আবু বাকার, হযরত যুবায়ের (রাঃ) ছিলেন মক্কার অত্যন্ত অভিজাত এবং সম্ভ্রান্ত মানুষ।

হযরত যায়েদের চতুর্থ স্ত্রী যয়নাব বিনতে জাহাশ

হযরত যায়েদের চতুর্থ পত্নি বাররাহ যয়নাব বিনতে জাহাশ অন্য কোন আরব নারী থেকে কোন দিক দিয়েই কম দামী বা নামী নন বরং বেশি। হযরত যয়নাব (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর ফুফু উমায়মা বিনতে আব্দুল মোত্তালিবের কন্যা। হযরত যায়েদ (রাঃ) ছিলেন পূর্বে আবদুল মুত্তালিবের পৌত্রিক (আবু লাহাব কন্যা) জামাতা। এখন হলেন আবদুল মুত্তালিবে দৌহিত্রী (উমায়মা কন্যা) জামাতা। য়নাবের পিতা ছিলেন জাহাশ ইবনে রিয়াব ইবনে ইয়ামার ইবনে শাররাহ। এ বিবাহতেও হযরত যায়েদ (রাঃ) সুখী হতে পারেননি। বিবাহটি হয়েছিল অনেকটা ঘটনাক্রমে।

হিজরী ৩ বা ৪ সালে রাসূলুল্লাহ্‌ (রাঃ) তাঁর ফুফাত বোন বাররাহ যয়নাবের বিবাহের প্রস্তাব করেন উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে। এ উপযুক্ত পাত্র বলতে হযরত যয়নাব (রাঃ) তার মামাত ভাই রাসূলুল্লাহ্‌কে বুঝেছিলেন এবং তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু তিনি যখন জানতে পারলেন যে, যয়নাবের জন্য পছন্দনীয় পাত্র রাসূল (সাঃ) নিজে নন, বরং রাসূলের আযাদকৃত গোলাম যায়েদ বিনতে হারিসা (রাঃ) একথা শুনে তিনি তো আকাশ থেকে পড়লেন।

প্রথমে রাসূলুল্লাহ্‌র পছন্দনীয় পাত্রের সঙ্গে বিবাহের সম্মতি জ্ঞাপন করলেও পাত্র হিসেবে যায়েদ ইবনে হারিসার নাম শুনে যয়নাব (রাঃ) বেঁকে বসলেন এবং অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তার ভ্রাতা আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে জাহাশও এ প্রস্তাবের বিরোধীতা করেন।

www.nagorikpathagar.org

যায়েদ ইবনে হারিসা (রাঃ) ছিলেন পিতৃ কুলের দিক দিয়ে আরবের সুবিখ্যাত অভিজাত গোত্র বনি কালবের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং মাতৃকুলের দিক দিয়ে তায়্যিই গোত্রের। গোত্রীয় মর্যাদা ও আভিজাত্যের দিক দিয়ে কোন দিক দিয়ে তিনি কুরাইশদের কম ছিলেন না।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একজন মুসলিম যুবক এবং যুবতির জন্য বিয়ে ঠিক করেছেন, আর এ বিয়েটি হবেনা– এটা কোন মুসলিমের পছন্দ ছিল না। আল্লাহ্রও পছন্দ ছিল না। যয়নাব বিনতে জাহাশের অমত লক্ষ্য করে হযরত যায়েদ ইবনে হারিছাও তার এ চতুর্থ বিয়েতে আপত্তি করে বসলেন।

ইতিপূর্বে মুসলিম ইতিহাসে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ফয়সালা হয়নি যাতে, ঘটনার দু'পক্ষই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সঙ্গে অমত করে বসেছে। বিষয়টি আল্লাহ্র রাসূলের নিকট ছিল খুবই বিব্রতকর। যা রাসূলের জন্য বিব্রতকর তা রাসূলের মালিকের জন্য সুখকর ছিল না। এ প্রসঙ্গেই আয়াত নাযিল হল। "আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ্ এবং রাসূলকে অমান্য করলে সে তো হবে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট (দালালাম মুবিনান)। আল-কুরআন ৩৩ঃ৩৬।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার সঙ্গেই হযরত যয়নাব (রাঃ) ও তার পরিবারের সদস্যবর্গ এ বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। বিবাহের সময় যয়নাবের বয়স ছিল ৩৪ বছর এবং তিনি কুমারী ছিলেন। ইতিপূর্বে তার কোন বিবাহ হয়ে থাকলেও প্রথম স্বামীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। এ বিবাহের ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়।

যে পরিবারে রাসূলের তৃতীয়া কন্যা উম্মে কুলসুমের মাত্র ৪ (চার) বছর বয়সে আবু লাহাব পুত্র উতাইবার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়, সে কুরাইশ বংশের কোন কন্যা ৩৪ বছর পর্যন্ত অবিবাহিত থাকেন– তা অদ্ভুত লাগে। স্বামী সম্বন্ধে হযরত যায়নাবের প্রত্যাশা এত উপরে ছিল যে, একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ছাড়া কারো পক্ষে তা পূরণ করা সম্ভব ছিল না।

আরবগণের মধ্যে বহু বিবাহ অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। তা সত্ত্বেও হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) ছিলেন অবিবাহিতা।

বিবাহ হয়ে যাওয়ার পরেই যায়দ (রাঃ) এবং য়যনাবের (রাঃ) সংক্ষিপ্ত দাম্পত্য জীবন সুখকর হয়নি। হযরত যয়নাব (রাঃ) এর স্বভাব ও মেজাজ যথেষ্ট উষ্ণ ছিল। ফলে এক বছর পার না হতেই হযরত যায়েদ রাসূলুল্লাহ্র নিকট অভিযোগ পেশ

www.nagorikpathagar.org

করলেন এবং তাকে তালাক প্রদানের অভিপ্রায় ব্যক্তি করলেন। (তিরমিযি শরিফ; ফাতহুল বারী, অষ্টম খন্ড ; পৃঃ ৪০৩)।

রাসূলুল্লাহ্ তাকে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিলেন এবং আল্লাহকে ভয় করতে উপদেশ দিলেন। আল-কুরআনেও বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে। "আল্লাহ্ যাকে (যায়েদ) অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, তুমি তাকে বলছিলে, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর। (সূরা আহজাব ; ৩৩ঃ৩৭)।

অবশেষে অল্প সময়ের মধ্যেই হযরত যায়েদ বিন হারিছা (রাঃ) নিজ দায়িত্বে রাসূলের ভিন্নমুখি পরামর্শ ও উপদেশ সত্বেও নিজের পারিবারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিলেন এবং হযরত যয়নাবকে তালাক দিয়ে দিলেন। নারী সম্পর্কে পাত্র যায়েদের প্রত্যাশা এমন যে, যা আরবের কুরাইশ বংশদ্ভূত তিনজন নারী অতীতে পূরণ করতে সমর্থ হননি।

হযরত যায়েদের ঈমানের স্তর

তবে এ বিবাহ ভাঙ্গার কারণ শুধু স্ত্রীর বংশ মর্যাদা নয়, আর কিছু ছিল। হযরত যায়েদ বিন হারিছা (রাঃ) ছিলেন মানুষ হিসেবে এক নাম্বারের। নির্ভেজাল তাকওয়া, ইখলাস, কুরবানী ইত্যাদিতে তার স্তরে পৌছা কোন নারীদের পক্ষেই হয়ত সম্ভব ছিল না। একজন ভিন্ন।

তায়েফে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একমাত্র সাহাবী হযরত যায়েদকে সাথে নেওয়ার মুসলিম মানসে হযরত যায়েদের মর্যাদা ছিল অত্যাধিক।

হযরত যায়েদ ইবনে হারিছা (রাঃ) এমন উচ্চ স্তরের মানুষ ছিলেন যে, উম্মুল আয়মান বারাকা ভিন্ন অন্য মানবীদের পক্ষে তার পছন্দনীয় ও প্রিয় ভাজন হওয়া কষ্টকর ছিল। বারাকাহ (রাঃ) ছিলেন হযরত যায়েদের পঞ্চম স্ত্রী।

হযরত যায়েদ বিন হারিছা (রাঃ) যে শুধু যায়নব বিনতে জাহাশকেই তালাক দিয়েছেন তা নয়, বরং তিনি আরবের চারজন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে নিজের উপযুক্ত মনে করেন নি। এটা তার অহংকার ছিল না। বরং এটা ছিল নারী সম্বন্ধে তার প্রত্যাশা।

হযরত যায়েদ ইবনে হারিছা (রাঃ) প্রকৃতিগত ভাবে অহংকারী হলে ইয়ামেনের একটি অভিজাত পরিবারের সম্ভ্রান্ত পুরুষ হওয়া বা পিতামাতার আদরের দুলাল হয়ে থাকার চেয়ে নবুওয়্যতের পূর্বেই মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর ন্যায় একজন মহা

www.nagorikpathagar.org

মানবের গোলাম বা খাদেম হয়ে থাকতে চাইতেন না।

বালক যায়েদা মহিয়সী নারী খাদীজার নিকটে থাকাই মাতৃ সান্নিধ্য অপেক্ষা বেশি পছন্দ করেছেন।

মানব ইতিহাসে বোধ হয় এমন ঘটনা নেই যে, ৮-১০ বছরের হারিয়ে যাওয়া একটি বালক পিতামাতার গৌরব দীপ্ত সন্তান হওয়া অপেক্ষা অন্য একটি পরিবারের খাদেম হিসেবে থাকা এবং একজন মহৎ মানুষের সান্নিধ্যে থাকাটাই বেশি পছন্দ করে।

যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রস্তাবে এবং তার আত্মীয় স্বজনের প্রাথমিক অমতে হযরত যায়েদের সঙ্গে হযরত যয়নাবের এ বিবাহ সংগঠিত হয়েছিল তাতে রাসূলুল্লাহ বেশ বিব্রত ছিলেন।

বিষয়টি সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে তিনি নিজেই যয়নাব বিনতে জাহাশকে বিবাহের সিদ্ধান্ত নেন এবং এ বিষয়টি প্রথমেই যায়েদ ইবনে হারিছাকে জানালেন। এ প্রস্তাবটি যায়েদ ইবনে হারিছার মাধ্যমেই তার প্রাক্তন স্ত্রী যায়েনাবের নিকট পাঠালেন। যয়নাব বিনতে জাহাশ কি সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দে আটখানা হয়ে এ প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন?

প্রস্তাব নিয়ে হযরত যায়েদ বিন হারিছা (রাঃ) হযরত যয়নবের গৃহে হাজির হন। তিনি তখন আটা পিশতেছিলেন। প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য সাহাবী যায়েদের ইচ্ছা ছিল হযরত যয়নবের মুখের দিকে তাকাবেন। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর মনে ধারণা হল রাসুললুল্লাহ্‌র সম্ভাব্য স্ত্রীর দিকে তাকান উচিত নয়। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "যয়নাব ! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আমি রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আপনার সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি"। জবাবে যয়নাব (রাঃ) বললেন "আমি ইস্তিখারা করা ছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব না। এ বলে তিনি সালাতের উদ্দেশ্যে স্থান ত্যাগ করলেন।

যায়েদ এবং যয়নাব বিনতে জাহাশের বিয়ে আল-কুরআনে নাযিলকৃত নির্দেশ অনুসারেই হয়েছিল (৩৩ঃ৩৬) এবং এ বিয়ে যখন যায়েদ কর্তৃক স্ত্রীকে প্রদত্ত তালাকের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ্‌র সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাও আল্লাহ্‌র নির্দেশেই হয়েছে। (৩৩ঃ৩৭)।

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রাঃ) বলেছিলেন – রাসূলুল্লাহ্‌র মৃত্যুকালে যদি যায়েদ ইবনে হারিছা জীবিত থাকতেন তবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হয়ত তার খালিফা বা প্রতিনিধি নিজেই মনোনীত করে যেতেন এবং সেই খলিফা হত (তাঁর পিতা আবু বাকার

www.nagorikpathagar.org

(রাঃ) নয়) বরং যায়েদ ইবনে হারিছা (রাঃ)। এটাও মনে হয় ছিল অতি উর্ধ্ব মূল্যায়ণ। (হাফিজ জামালুদ্দিন আবুল হাজ্জাজঃ তাইজিবুল কামাল ফী আসমাউর রেজাল ৬ষ্ঠ খন্ড পৃঃ ৪৩৯) ইবন হাজার। আল ইসাবা ১ম খন্ড, ইবন সাদঃ তারাকাত ৩য় খন্ড, পৃঃ ৪০-৪৭, পৃঃ ৫৬৪; আল যাহাবী ঃ সিয়ারু আলামীন নুবালা, ১ম খন্ড, পৃঃ ২২৮)।

উম্মুল মুমিনিন আয়েশার (রাঃ) পক্ষে তার পিতার তুলনায় যায়েদ ইবনে হারিছার (রাঃ) এরূপ মূল্যায়নে হযরত যায়েদ ইবনে হারিছা (রাঃ) কত উচ্চস্তরের মানুষ ছিলেন তা কিছুটা অনুধাবন করা যায়।

www.nagorikpathagar.org

উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)

দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের (রাঃ) সুযোগ্য পুত্র ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)। হযরত আবু বাকারের (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বেই হযরত উমারকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। হযরত উমারকে পরবর্তী খলিফা হিসেবে হযরত আবু বাকার (রাঃ) প্রস্তাব করেন এবং অন্যান্যদের সমর্থন ও আনুগত্য আদায় করে নেন।

দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমার (রাঃ) ইরানী কৃতদাস আবু লুলু ফিরোজ কর্তৃক মারাত্মক ভাবে আহত হন। ইসলামের দুশমনগণ তাদের ষড়যন্ত্রের গুঁটি হিসেবে নাসারা আবু লুলুকে ব্যবহার করেছিলেন। খলিফা উমার (রাঃ) ভয় করলেন যে, তাঁর শাহাদাতের পর জনগণ হয়ত তাঁর সুযোগ্য পুত্র আব্দুল্লাহকেই তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত করতে পারেন। তাই তিনি ওয়াছিয়ত বা মৃত্যুকালীন সিদ্ধান্ত দিয়ে যান যে– আব্দুল্লাহকে পরবর্তী খলিফা নিযুক্ত করা যাবে না। কারণ খেলাফতের গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য কোন বংশের একজনই যথেষ্ট।

পিতৃ পরিচয়

আব্দুল্লাহ ইবনে উমারের সমবয়সী ছিলেন হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) অর্থাৎ, যায়েদের পুত্র উসামা। তাঁর উপনাম ছিল হুববুর রাসূলুল্লাহ অর্থাৎ রাসূলের প্রিয়পাত্র (ইবনে হাজর: তাহজিবুত তাহজীব; ইবনুল আসির উসদুল গাবা)।

হযরত যায়েদ (রাঃ) ছিলেন মুসলিম ইতিহাসের সর্ব প্রথম ঈমান আনয়ণকারী মুসলিমা উম্মুল মুমিনিন হযরত খাদিজার ক্রীতদাস। তিনি দাস হিসেবে বিক্রয় হন প্রায় ৮ বছর বয়সে।

হযরত খাদিজা (রাঃ) যায়েদকে উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন তারই ভ্রাতুষ্পুত্র এবং যায়েদের ক্রেতা হাকিম ইবনে হিজাম ইবনে খুওয়াইলিদ থেকে।

হযরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রাঃ) এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর বিবাহের পর বালক ক্রীতদাস যায়েদকে উপহার হিসেবে রাসূলুল্লাহকে প্রদান করেন। তৎকালে আরবে উপহার উপঢৌকন হিসেবে দাস-দাসী প্রদানের প্রথা ছিল।

রাসূলল্লাহ্র পিতা আব্দুল্লাহ বিবি আমিনার সঙ্গে বিবাহের পূর্বেই তাঁর স্ত্রীকে উপহার হিসেবে প্রদানের জন্যে একজন ক্রীতাদাসী ক্রয় করে রেখেছিলেন। তাঁর নাম বারাকাহ (রাঃ)।

www.nagorikpathagar.org

নবপরিণীতা স্ত্রীর নিকট থেকে উপহার হিসেবে যায়েদকে পাবার পর রাসূলুল্লাহ্ তাকে আযাদ করে দেন। যায়েদের বয়স তখন প্রায় পনের।

যায়েদের পিতা হারিসা ও পিতৃব্য ক্বাব ইবন শারাহিল খবর পেয়ে তাকে ফেরৎ নেয়ার জন্য অর্থসহ রাসূলুল্লাহ্‌র নিকট আসেন। কিন্তু হযরত যায়েদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ত্যাগ করে পিতা ও পিতৃব্যের সঙ্গে যেতে রাজী হননি।

রাসূলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রতিদানে দাস যুবক যায়েদকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত উমারের (রাঃ) সময়ে মুসলিম খিলাফত বা রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলার চরম উন্নতি ঘটে। হেজাজ থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত পথে কোন নিঃসঙ্গ ভ্রমণকারী সুন্দরী যুবতী রমণীর দিকে লোভাতুর অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকার মত মুসলিম পাওয়া যেত না। আইন শৃঙ্খলার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সে যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটে।

খলিফা উমার (রাঃ) কর্তৃক উসামার জন্যে নির্ধারিত ভাতা

এ সময় হযরত উমার (রাঃ) নাগরিকদের জন্য খেলাফতের পক্ষ থেকে ভাতা নির্ধারণ করে দেন। স্বীয় পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) অপেক্ষা হযরত উসামা ইবনে যায়েদের ভাতা অধিক নির্ধারণ করেন।

আরবের শ্রেষ্ঠ খানদানী বংশজাত কুরাইশ যুবক অপেক্ষা মুক্তিপ্রাপ্ত দাস যায়েদের পুত্র উসামার আতা বেশি হতে দেখে অনেকই বিস্মিত হন। সুবিচার ও ইনসাফের ক্ষেত্রে হযরত উমার (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়। এমন কি নির্মম ভাবে কঠোর।

হযরত উমার (রাঃ) ছিলেন সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী। তাঁর প্রদত্ত সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে আল কুরআনের বেশ কয়েকটি আয়াত পর্যন্ত নাযিল হয়। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক সময় বলেছিলেন যে– তাঁর পরে কেউ নবী হলে তা হতেন উমার ইবনে খাত্তাব। অবশ্য সার্বিক বিবেচনায় হযরত আবু বাকার (রাঃ) ছিলেন অতুলনীয়।

বিচারের ক্ষেত্রে হযরত উমারের অকল্পনীয় সুক্ষ বিচার শক্তির কারণে তার উপাধি হয় আল- ফারুক। অর্থাৎ সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে ফরখকারী বা শ্রেষ্ঠ পার্থক্যকারী। তার বিচার সম্পর্কে যখনই কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করেছেন- তারা অত্যন্ত দাঁত ভাঙ্গা জবাব পেতেন।

অবশ্য খলিফা কর্তৃক নারীদের মোহরানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে এক জুমুয়ার দিন জোহরা নাম্নী এক মহিলা হযরত উমারের

www.nagorikpathagar.org

সাপ্তাহিক খুতবার পূর্বে যে প্রতিবাদ সূচক প্রশ্ন করেছিলেন হযরত উমার (রাঃ) নির্বাক হয়ে তা মেনে নেন এবং শুধু বলেন – উমারের থেকে জোহরা অধিকতর জ্ঞানী ও বিচার শক্তি সম্পন্না।

খলিফার পুত্র আব্দুল্লাহ্‌র ভাতা উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) অপেক্ষা কম হওয়ায় কয়েক ব্যক্তি খলিফার সিদ্ধান্তে প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য আব্দুল্লাহকে উদ্বুদ্ধ করেন। প্রশ্ন শুনে হযরত উমার (রাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন, "হে আব্দুল্লাহ! রাসূলুল্লাহ্‌র নিকট তোমার তুলনায় উসামা অধিক প্রিয় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌র নিকট তোমার পিতা উমার অপেক্ষা উসামার পিতা যায়েদ অধিকতর নিকটবর্তী ছিলেন। এ কারণে উসামার সঙ্গে তুমি আব্দুল্লাহ্‌র তুলনা হয় না এবং প্রিয় নবীর প্রিয় পাত্র যায়েদের সঙ্গেও উমারেরও তুলনা হয় না।" (ইবনুল আসির, উসদুল- গাবা) মক্কা বিজয়ের পর কাবাগৃহে প্রবেশকালে রাসূলুল্লাহ্‌র পরে যার ইচ্ছা হত তিনিই কাবা ঘরে প্রবেশ করতে পারতেন। অল্প কয়েকজন সঙ্গীর অন্যতম ছিলেন উসামা বিন যায়েদ মক্কা নগরীতে প্রবেশের সময়ও রাসূলের সঙ্গী ছিলেন উসামা (রাঃ) এবং রাসূলুল্লাহ্‌র দৌহিত্র যয়নাব পুত্র।

মদীনার আমীর

রাসূলুল্লাহ্‌র মৃত্যুর পর বহু নওমুসলিম এবং কাফিরের ধারণা হল- নবী হলে বিরাট নেতা হওয়া যায়, রাষ্ট্রপতি হওয়া যায়। তাই নও মুসলিমদের মধ্যে কয়েকজন ভন্ড নবীর আবির্ভাব হয়। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইসলামী শক্তিকে উৎখাত করার জন্য মদীনা ঘেরাও করে।

এ ফিতনার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক দীর্ঘ আলাপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ফিতনা সম্পূর্ণ নির্মূল হয়নি।

বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বাকার (রাঃ) এক বাহিনী নিয়ে আল– আবরাক নামক স্থানে গমণ করেন। ঐতিহাসিক তাবারীর ভাষ্য অনুযায়ী তা ছিল যুলকাদ মাসের ঘটনা। হযরত আবু বাকারের আল- আবরাক অভিযান কালে তিনি হযরত উসামাকেই মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত আমীর নিযুক্ত করে যান।

৮ম হিজরীর ৯ জমাদালউলা জর্ডানের পূর্বাংশে মৃত সাগরের দক্ষিণ পূর্বে মূতার যুদ্ধে রোমকদের বিরুদ্ধে প্রধান সেনাপতি ছিলেন উসামার পিতা যায়েদ (রাঃ)। এ যুদ্ধে হযরত যায়েদ (রাঃ) ইবনে হারিছার পরবর্তী সেনাপতি জাফর (রাঃ) ইবনে আবু তালিব এবং তার পরবর্তী সেনাপতি আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) শাহাদাৎ বরণ করার পর খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) প্রধান সেনাপতি নির্বাচিত হন সৈন্যদের

www.nagorikpathagar.org

আস্থার প্রেক্ষিতে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রেরিত দূত হারিসা ইবনে উমায়রকে হত্যা করা হয় রোম সম্রাটের সিরিযা প্রদেশের গভর্ণর শুরাহবিল ইবনে আমর গাসসানীর নির্দেশে। এর প্রতিবাদে মুতায় যুদ্ধ হয়।

নবী প্রেরীত সর্বশেষ অভিযানের নেতৃত্ব

মুতার যুদ্ধের পর রোমকদের বিরুদ্ধে জর্ডান নদীর পূর্ব তীরে ১১ হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর জীবনের সর্বশেষ অভিযান প্রেরণ করেন। এ অভিযানের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন তরুণ, কিশোর উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)। এ সময় তাঁর বয়স ১৭ এর বেশি হয়ত হয়নি। এত কম বয়সীকে সেনাপতি নিযুক্ত করায় অনেকেই তাকে নেতা হিসেবে মানতে আপত্তি করেন।

তৃতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত উহুদ যুদ্ধে উসামা ১২ বছরের কম হওয়ার কারণে যুদ্ধে গমণের অনুমতি পাননি। এরূপ একজন অল্প বয়েসী নওজোয়ান হলেন সেনাপতি। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রেরিত অভিযানকালে সৈন্য দলের মধ্যে ছিলেন হযরত আবু বাকার (রাঃ) উমার (রাঃ) হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) প্রমূখের মত প্রবীণ, সুদক্ষ, সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাহাবীবৃন্দ। আর তাদের নেতা হলেন মুক্ত দাস যায়েদ পুত্র ১৭ বছর বয়স্ক যুবক উসামা (রাঃ)।

হযরত উসামার নেতৃত্বের ব্যাপারে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের আপত্তির সংবাদ শ্রবণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অসুস্থতা সত্ত্বেও কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে উসামার সেনাপতিত্বের স্বপক্ষে ভাষণ দেন এবং তিনি হযরত উসামাকে স্বহস্তে যুদ্ধে পতাকা প্রদান করেন।

হযরত উসামা (রাঃ) তাঁর বাহিনী নিয়ে রোমান সাম্রাজ্যাধীন সিরিয়ার জর্ডান সীমান্তের দিকে রওয়ানা হলেন। কিন্তু প্রথম মঞ্জিল বা অবস্থানস্থল জুরফ নামক স্থানে পৌঁছতেই খবর পান যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাই তিনি বাহিনী নিয়ে দ্রুত মদীনায় ফিরে আসেন। যেদিন মদীনায় পৌঁছলেন সেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অজ্ঞান অবস্থা অতিক্রম করে চেতনা ফিরে পান। উসামাকে দেখে তিনি তাকে পুনরায় যুদ্ধে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন।

রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশক্রমে হযরত উসামা (রাঃ) বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন। এবারও হযরত আবু বাকার (রাঃ) এবং উমারের ন্যায় প্রথম কাতারের সাহাবীরা সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

হযরত উসামা (রাঃ) তাঁর বাহিনী নিয়ে প্রথম মঞ্জিল জুরফ নামক স্থানে পুনরায় উপস্থিত হন। কিন্তু জুরফ ত্যাগ করার পূর্বে তাঁর মাতা উম্মে আয়মন বারাকাহ্ হতে সংবাদ পান যে, যে কোন সময়ে রাসূলুল্লাহ্র ইন্তেকাল ঘটতে পারে। এ সংবাদ

www.nagorikpathagar.org

পেয়ে তিনি পুনরায় মদীনায় ফিরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌র দাফনে শরীক হন। তাঁর পবিত্র দেহ কবরে রাখায়ও অংশগ্রহণ করেন।

হযরত উসামার পিতা যায়েদ (রাঃ) এবং মাতা বারাকাহ (রাঃ) প্রথমে ক্রীতদাস হলেও তারা উভয়েই ছিলেন বিবাহের পূর্বেই আজাদকৃত। হযরত উসামা (রাঃ) আজাদকৃত দাস দাসী পুত্র হলেও তিনি নিজে ক্রীতদাস ছিলেন না।

খলিফা আবু বাকার (রাঃ) প্রেরীত প্রথম অভিযানের নেতৃত্ব

রাসূলুল্লাহ্‌র ইন্তেকালের পর হযরত আবু বাকার (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হলেন। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পরই তিনি হযরত উসামাকে নির্দেশ দিলেন সেনাবাহিনীসহ সিরিয়া অভিযানের। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌র ইন্তেকালের পর গোলযোগের দাবানল চারিদিকে জেগে উঠল।

এ অবস্থায় সম্মানিত সাহাবীগণের অভিমত হল– রোমক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করে যুদ্ধের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত না করার।

সাহাবীদের অভিমতের প্রতি হযরত আবু বাকারের নীরব উপেক্ষা লক্ষ্য করে হযরত উমার (রাঃ) বুঝতে পারলেন যে, সিরিয়া অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত নব নির্বাচিত খলিফা পরিবর্তন করবেন না। তাই তিনি মধ্যম পন্থা হিসেবে প্রস্তাব দিলেন যে, একজন প্রবীণ, অভিজ্ঞ এবং সুদক্ষ সেনাপতিকে উসামা বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হোক।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌র একনিষ্ঠ সাহাবী হযরত আবু বাকার (রাঃ) মহানবীর নির্দেশের এক বিন্দুও সংশোধন করতে সম্মত হলেন না। উসামার নেতৃত্বে রোমক সীমান্তে অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) নিজে। তাই এ নির্দেশ পালন করতেই হবে।

উসামার নেতৃত্বাধীন অভিযানের সাফল্য

হযরত আবু বাকারের (রাঃ) দৃঢ়তা ও অনঢ় অভিমত এবং সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত উসামা (রাঃ) প্রস্তাবিত অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন এবং সিরিয়ার অন্তর্গত জর্ডান নদীর পূর্বে আবনী পর্যন্ত পৌঁছলেন। যা বর্তমানে 'খানুয যায়ত' নামে পরিচিত। তিনি দামেষ্কের নিকটবর্তী আল মির্জা নামক স্থানেও শিবির সন্নিবেশ করেন।

মুতায় তিন হাজার মুসলিম মুজাহিদের মোকাবেলায় রোমানগণ লক্ষাধিক সৈন্য সমাবেশ করেছিল। কিন্তু তাবুক অভিযানের কারণেই হয়তো উসামা বাহিনীর বিরুদ্ধে তারা তেমন দৃঢ় অবস্থান নেয়নি।

www.nagorikpathagar.org

উসামার (রাঃ) নেতৃত্বাধীন এ অভিযান সম্পূর্ণ সার্থক এবং সফল হল। রাসূললূল্লাহ্‌র ইন্তেকাল জনিত দুঃখ-বেদনার কিছুটা কাফ্‌ফারা আদায় হল। এ বিজয়ে মদিনায় আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হল।

হযরত উসামা (রাঃ) কয়েকটি বিবাহ করেন। তাঁর সন্তান সন্ততিও ছিল বহু। তাক্বওয়া এবং পরহেজগারীতে উসামা ইবনে যায়েদ ছিলেন হযরত আবু জর গিফারী (রাঃ) এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উমারের অনুরূপ।

রাসূলের স্নেহ-ধন্য

উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্‌র দৌহিত্র হযরত হাসান (রাঃ) ও হুসাইনের (রাঃ) ন্যায় রাসূলুল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হন। এ হিসেবে তার বিশেষ মর্যাদা ছিল। সাহাবীগণও তাকে সম্মান করতেন। হযরত আবু বাকার, উমার এবং জলিলুল ক্বদর সাহাবীগণ উসামা বিন যায়েদকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। তিনি হযরত আবু বাকার (রাঃ) এবং উমারের স্নেহাসিক্ত ছিলেন। হযরত উসামার মাতা ছিলেন রাসূলুল্লাহ্‌র ধাত্রীমাতা উম্মে আয়মান বারাকাহ (রাঃ)।

হযরত উসামা (রাঃ) অত্যন্ত সাদাসিধা ও সরল জীবনযাপন করতেন। বিলাসীতার কোন স্পর্শ তাঁর জীবন যাত্রায় লাগেনি। বহু সংখ্যক সন্তানের জন্মদাতা হয়েও মৃত্যুকালে তিনি কোন অর্থ সম্পদ রেখে যাননি। যেমন রেখে যাননি প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)।

উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) ছিলেন খালেছ তৌহিদবাদী। হযরত উসমানের খিলাফতের শেষ দিকে যে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছিল তা হতে হযরত উসামা (রাঃ) নিজেকে স্বযত্নে দূরত্বে সংরক্ষণ করেন। তিনি হযরত আলীকে (রাঃ) হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত মনে করতেন এবং হযরত মোয়াবিয়ার (রাঃ) বিপক্ষে হযরত আলীর পক্ষ অবলম্বন করেননি। তবে হযরত উসামা নিজের এ সিদ্ধান্ত তিনি সঠিক মনে করেননি।

মক্কা বিজয়ের সময় একই উটে রাসূলুল্লাহ্‌র সঙ্গে পশ্চাতে আসীন ছিলেন হযরত উসামা (রাঃ)। তাঁর উটের সম্মুখ ভাগে ছিলেন হযরত বিলাল, হযরত তালহা এবং হযরত উসমান (রাঃ)।

উসামা পিতা হযরত যায়েদকে রাসূলুল্লাহ্‌ এত ভাল বাসতেন এবং তাঁর উপর এত অধিক রাসূল (সাঃ) আস্থাশীল ছিলেন যে, এ বিষয়ে হযরত আবু বাকার (রাঃ) কন্যা উম্মুল মুমিনিন আয়েশার (রাঃ) একটি অভিমত প্রনিধানযোগ্য। উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর ইন্তেকালের সময় যদি যায়েদ ইবনে হারিছা (রাঃ) জীবিত থাকতেন, তবে রাসূল (সাঃ) তাকেই খলিফা মনোনয়ণ করে যেতেন।

www.nagorikpathagar.org

হযরত সুমাইয়্যা বিনতে খাবাত (রাঃ)

ইসলামের ইতিহাসে সর্ব প্রথম মুসলিম এবং সর্ব প্রথম শহীদ হলেন দু'জন নারী। সর্ব প্রথম মুসলিম ছিলেন উম্মুল মুমিনিন খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রাঃ) এবং সর্ব প্রথম শহীদ ছিলেন হযরত সুমাইয়্যা বিনতে খাবাত (রাঃ)। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীরের মাতা।

আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রাঃ) ছিলেন আজীবন মুজাহদী। ৯০ বছর বয়সে তিনি সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত মুয়াবিয়ার (রাঃ) মধ্যে সিফ্‌ফিনের ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় সাত দিন ব্যাপী এ যুদ্ধ। হযরত আম্মারের শাহাদাত দিবসে তিনিই ছিলেন হযরত আলীর (রাঃ) পক্ষে এ যুদ্ধের সেনাপতি।

হযরত সুমাইয়্যা বিনতে খাবাত (রাঃ) মহিলা এবং দাসী ছিলেন বলে তাঁর সম্বন্ধে এবং তাঁর বংশধারা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। তিনি ছিলেন হযরত আবু হুজায়ফা ইবনে মুগীরা মাখযুমির দাসী।

হযরত সুমাইয়া (রাঃ) এবং তাঁর স্বামী ইয়াসীর (রাঃ) প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক ইবনে আসীর এবং হাফেজ ইবনে হাযার এর বর্ণনা মতে, "ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে হযরত সুমাইয়্যা (রাঃ) ছিলেন সপ্তম।

দাসী হওয়ার কারণে তাকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য চরম নির্যাতনের সম্মুখিন হতে হয়। তাঁরা (দাস দাসীরা) ছিল সমাজে অবহেলিত এবং উপেক্ষিত। তাদের স্বাধীন নাগরিকের মত অধিকার এবং নিরাপত্তা ছিল না।

হযরত খাদীজা, আলী ও আবু বকরের ন্যায় ব্যক্তিদের উপর নির্যাতন মাত্রা তীব্র এবং অসহনীয় হলে তাদের বংশের লোকদের উপর এর প্রতিক্রিয়া হত এবং যারা সীমাহীন অত্যাচার করত তাদের বিরুদ্ধে নির্যাতিত ব্যাক্তির গোত্র এবং বংশের মধ্যে রুখে দাঁড়াবার ভয় ছিল। কিন্তু দাস-দাসী বিলাল, খাব্বাব, সুহাইব, ইয়াসীর, সুমাইয়া (রাঃ) এদের জন্য অভিজাত গোত্রগুলোর রুদ্ররোষের ভয় ছিল না।

নও মুসলিম সুমাইয়্যার উপর অত্যাচার তাঁর মালিকের পক্ষ থেকে ছিল না। তাঁর উপর দৈহিক নির্যাতন আসতো মালিক বহির্ভূত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে।

মুশরিকগণ সুমাইয়্যাকে তাঁর মালিকের গৃহ থেকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে টানা হেঁচড়া করে বাইরে নিয়ে যেত। উত্তপ্ত বালির উপর দাঁড় করিয়ে রাখত।

www.nagorikpathagar.org

লোহার বর্ম এবং পোশাক পড়িয়ে প্রখর সূর্য তাপে দগ্ধ করত। বেত্রাঘাত, চাবুকাঘাত ছিল অতি সাধারণ শাস্তি। সুমাইয়্যা পরিবারের তিনজনই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। বাকী দু'জন ছিলেন–তাঁর স্বামী ইয়াসীর এবং পুত্র আম্মার।

সুমাইয়্যা (রাঃ) যখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তখন তিনি প্রকৃত দাসী ছিলেন না। তাঁর মালিক আবু হুজায়ফা আম্মারের জন্মের পরেই তাকে আযাদ করে দেন (আল -ইসতিয়াব, দ্বিতীয় খণ্ড; পৃঃ-৫৫৯)।

সুমাইয়্যার স্বামী ইয়াসীর এবং তাঁর মালিক আবু হুজায়ফা ছিলেন – পরস্পরের বন্ধু। বন্ধু আবু হুজায়ফার দাসী সুমাইয়্যাকে ইয়াসীরের পছন্দ হয়ে যাওয়ায় তিনি (ইয়াসীর) বন্ধুর দাসীকেই বিয়ে করেন। (আল ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড; পৃঃ ৭৫৯)।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সুমাইয়্যা (রাঃ) তাঁর পুত্র আম্মার (রাঃ) এবং স্বামী ইয়াসীর (রাঃ) এর উপর মক্কার ইসলাম বিরোধীদের নির্যাতনের বিষয়ে অবহিত ছিলেন। তাদেরকে নির্যাতিত হতে দেখে তিনি উপদেশ দিয়ে বলতেন, "হে ইয়াসীর পরিবার! ধৈর্য্য ধারণ কর। জান্নাতে তোমাদের স্থান নির্ধারিত আছে"। (উসুদুল গাবা; ৫ম খণ্ড; পৃ- ৪৮১)।

চরম ধৈর্য ধারণ করেও তাঁরা নিস্তার পান নি। তাদের দিবা-রজণী অতিবাহিত হতো নির্যাতনের কবলে পড়ে। সুমাইয়্যার উপর নির্যাতনকারীদের অন্যতম ছিলেন-ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমন আবু জাহল।

এক রাত্রে সুমাইয়্যার কক্ষে প্রবেশ করে আবু জাহল ইসলামের সাধ মিটিয়ে দেয়ার জন্য তাঁর নারী অঙ্গে বর্শার আঘাত করে। এই আঘাতেই তিনি (হযরত সুমাইয়্যা) শাহাদাত বরণ করেন। (আল-ইসতিয়াব-২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৬০)।

মায়ের মৃত্যুতে ব্যথা বিদূর আম্মার (রাঃ) ছুটে যান শান্তনার জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র সন্নিধানে। কিন্তু মুসলিমদের অবস্থা তখন এমন নাযুক ছিল যে ধৈর্য্য ধারণ করা ছাড়া প্রতিবাদেরও কোন উপায় ছিল না।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রাব্বুল আলামীনের নিকট মুনাজাতে বলেছিলেন, "আল্লাহুম্মা লা তুয়াজ্জিব আহাদান মিন আলে ইয়াসীরা মিন নার"। অর্থাৎ, "হে প্রভু! ইয়াসীরের পরিবারের কাউকে তুমি জাহান্নামের শাস্তি দিও না"।

www.nagorikpathagar.org

ইয়াসীর ইবন আমীর (রাঃ)

ইসলামের ইতিহাসের প্রথম শহীদ সুমাইয়্যা বিন খাবতের স্বামী ইয়াসীর (রাঃ) ছিলেন একজন ইয়েম্যানী সাহাবী। তার পূর্ন নাম ইয়াসীর ইবনে আমীর ইবনে মালিক আল আনাসী।

ইয়াসীরের এক ভাই নিখোঁজ হয়ে যায়। ভাতৃহারা তিন ভাই ভ্রাতৃসন্ধানে ইয়েমেনের বহু স্থান পরিভ্রমণ করে মক্কায় হাজির হন। ইয়াসীরের সাথী অপর দু'ভাইয়ের নাম ছিল – হারিস এবং মালিক।

মক্কায় থাকাকালে ইয়াসীরের সঙ্গে আবু হুজায়ফা ইবনে মুগীরা আল মাখযুমির পরিচয় হয়। এই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

ইয়াসীরের দু'ভাই হারিস এবং মালিক ইয়েমেন প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ইয়াসীর মক্কায়ই থেকে যান।

ইয়াসীর (রাঃ) অত্যন্ত, কোমল-হৃদয় স্নেহপ্রবন বন্ধুবৎসল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মক্কায় তার বন্ধু আবু হুজায়ফার সংসারে থেকে সাংসারিক কাজ কর্ম এবং ব্যবসা বাণিজ্যে মনোযোগ দেন।

আবু হুজায়ফার সুমাইয়্যা বিনত খাবাত নাম্মী বহু গুণাগুন সম্পন্না নেক বক্ত এক ক্রীতদাসী ছিল।

ইয়াসীরের এই মানবিক গুন সম্পন্না ক্রীতদাসী পছন্দ হয়ে যায়। তিনি বন্ধুর নিকট তাঁর ক্রীতদাসীকে বিবাহের প্রস্তাব দেন।

আবু হুজায়ফাও বিষয়টি তাঁর জন্য অনুকুল মনে করেন। কারণ এ বিবাহের ফলে তাকে আর কখন বন্ধু হারা হতে হবে না। ইয়াসীর (রাঃ) শুধু বন্ধু নয় ভাই হিসেবে আবু হুজায়ফার পরিবারের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলেন।

পরবর্তীতে এ বিবাহ আবু হুজায়ফার জন্য চিরস্থায়ী সৌভাগ্যের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। সুমাইয়্যা এবং তার পুত্র আম্মার দুই বন্ধু (ইয়াসীর এবং আবু হুজায়ফা) অপেক্ষা আরও প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

সুমাইয়্যার গর্ভে পুত্র আম্মারের জন্মের পর আবু হুজায়ফা সুমাইয়্যাকে আযাদ করে দিয়ে বন্ধু পত্নী হিসেবে গ্রহণ করেন।

ইয়াসীর, সুমাইয়্যা, আম্মার ছিলেন আমৃত্যু আবু হুজায়ফা পরিবারের বন্ধু।

www.nagorikpathagar.org

তারা কখনও বিচ্ছিন্ন হননি।

ইয়াসীর এবং সুমাইয়্যার আরও একটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে তার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্।

রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর যারা তার ডাকে তাৎক্ষণিক সাড়া দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন ইয়াসীর, সুমাইয়্যা, আম্মার ও আব্দুল্লাহ্।

প্রথম দিককার মুসলিম হওয়ার কারণে ইয়াসীর, সুমাইয়্যা, আম্মারকে মর্মন্তুদ এবং নিদারুণ শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল।

নির্মম ও মর্মান্তিক ভাবে ইয়াসীর এবং সুমাইয়্যাকে শাহাদাত বরণ করতে হয়। সুমাইয়্যাকে বনি মুগীরা এর মালিকানাধীন উপত্যকায় নিয়ে দৈহিক শাস্তি প্রদান করা হত। সুমাইয়্যার যৌনাঙ্গে আবু জাহলের বর্শার আঘাতের ফলে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। জাহাবিঃ তাজ রিদু আসমাইশ সাহাবা-২য় খন্ড। ইবনে সা'দর তাজকিরাতুল কুবরা- তৃতীয় খন্ড। ইবনে আব্দিল বার : আল-ইসতিয়ার-৪র্থ খন্ড। ইবনে হাজার: তাগবিরুত তাহজিদ-২য় খন্ড)।

www.nagorikpathagar.org

আম্মার ইবনে সুমাইয়্যা (রাঃ)

হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ) এর একজন অতি প্রিয় সাহাবী ছিলেন হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)। তাঁর পিতা ইয়াসির (রাঃ) ছিলেন মাখযুম গোত্রের আবু হুযায়ফা ইবনে মুগীরা মাখজুমীর একজন মাওলা।

মাওলা শব্দের বহু অর্থ আছে। যেমন–মাওলা অর্থ প্রভু, মাওলা অর্থ বন্ধু, আশ্রিত মাওলা অর্থ দাস, মাওলা অর্থ কোন গোত্রের সঙ্গে সংযুক্ত বন্ধু।

আল-কুরআনের আয়াত মুনাজাতে আমরা পাঠ করি "আন্তা মাওলানা, ফানচুরনা আ'লাল কাওমীল ক্বাফিরীন"। দোয়াটির অর্থ (হে আল্লাহ্ তুমি আমাদের মাওলা (আমাদের প্রভু)। আমাদেরকে ক্বাফির কওমদের উপর বিজয় রূপ সাহায্য দান কর।

ধর্মীয় জ্ঞানী ব্যক্তিগণও মাওলানা (আমাদের মাওলা) নামে উল্লেখিত হয়ে থাকেন।

ইসলামে প্রথম যুগে দু'ব্যক্তি পারস্পরিক বন্ধুত্ব চুক্তিতে আবদ্ধ হলে তাদেরকে মাওলা বলা হত। সাধারণত দুর্বল ব্যক্তিরা অথবা বহিরাগতরা স্থানীয় লোকদের সঙ্গে মাওলা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে বলীয়ান হতেন।

আম্মারের বংশগত পূর্ণ নাম হল – আম্মার ইবনে ইয়াসীর ইবনে আমীর ইবনে মালিক আবুল ইয়াকজান।

আম্মারের পিতা ইয়াসির তার বন্ধু আবু হুযায়ফার দাসী সুমাইয়্যা বিনতে খাবাতকে পছন্দ করে দাসী বিবাহ করেন। সুমাইয়া বিনতে খ্যাবাত এর গর্ভে ইয়াসিরের পুত্র আমারের জন্মের পর আবু হুজায়ফা ইবনে মুগীরা মাখযুমী তার দাসী সুমাইয়্যাকে আযাদ করে দেন। ইয়াসীর স্ত্রী সুমাইয়্যাকে নিয়ে পৃথক সংসার করেন নি বরং স্বামী স্ত্রী উভয়েই স্বামীর বন্ধু হুজায়ফার পরিবারে ভ্রাতা হিসেবেই থেকে যান। আম্মার ইবনে সুমাইয়্যা বিন খ্যাইয়্যাত ক্রীতদাস ছিলেন না।

ইয়াসির (রাঃ) এবং তার স্ত্রী সুমাইয়্যা (রাঃ) ও পুত্র আম্মার (রাঃ) ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক ইবনে কাসির এবং হাফিজ ইবনে হাজার এর বর্ণনা মতে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে দাসী হযরত সুমাইয়্যা বিনত খ্যাব্যাত ছিলেন সপ্তম। তিনি ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে প্রথম শহীদ।

www.nagorikpathagar.org

যেমন–উম্মুল মু'মিনিন খাদীজা বিনতে খুওয়ালীদ ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের প্রথম মুসলিম। অর্থাৎ ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম এবং প্রথম শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন নারী।

দাসী হওয়ার কারণে মক্কার কুরাইশগণ ছিলেন হযরত সুমাইয়্যা বিনত খাবাতের প্রতি খড়্গহস্ত এবং ক্রোধান্ধ। ইয়াসির, সুমাইয়্যা, আম্মার – এ তিন জনকেই কাফিরগণ নানাভাবে নির্যাতন করত।

মুশরিকগণ সুমাইয়্যা বিনতে খাবাতকে লোহার পোশাক পরিধান করিয়ে মক্কার নিকটস্থ মরুভূমির উত্তপ্ত বালির মাঝে ফেলে রাখত। এ শাস্তি শুধু তাকেই নয়, তার স্বামী ইয়াসির (রাঃ) এবং পুত্র আম্মারকেও দেয়া হত।

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও স্বীয় চক্ষে এ নির্যাতন লক্ষ্য করতেন। কখন কখন তাদেরকে সান্তনা স্বরূপ বলতেন–হে ইয়াসির পরিবার ! ধৈর্য ধারণ কর। তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। রাসূলুল্লাহ্‌র এ আশ্বাস বাণী তাদের নিকট স্বর্গীয় সুধা রূপে অনুভূত হত।

সুমাইয়্যার নারী সঙ্গে আবু জহল কর্তৃক বর্শার আঘাতের ফলে তিনি শাহাদাৎ বরণ করলেন। মায়ের মৃত্যুর খবর নিয়ে আম্মার রাসূলুল্লাহ্‌র নিকট এলেন। রাসূল তাকে সান্তনার বাণী শুনালেন এবং মুনাজাত করলেন–হে আল্লাহ্ ! ইয়াসির পরিবারের কাউকে তুমি দোযখের শাস্তি দিও না। (আল্লাহুম্মা লা তুয়াজ্জেব আহাদান মিন আলে ইয়াছিরা বিন নার)।

বদর যুদ্ধে আবুল হাকাম অর্থাৎ আবু জেহেল নিহত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তখন আম্মারকে বলেছিলেন – আল্লাহ তা'আলা তোমার মায়ের হত্যাকারীকে হত্যা করিয়েছেন। (কাদ কাতালাল্লাহু কাতেলা উম্মিকা)।

আম্মার পরিবারের উপর চরম নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ্ আম্মারকে আবি সিনিয়ায় হিজরতের নির্দেশ দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় হিজরত করার পর আম্মারও মদীনায় চলে যান।

বদর, উহুদ এবং অন্যান্য প্রায় সকল জেহাদে রাসূলুল্লাহ্‌র নিকটতম সঙ্গী ছিলেন আম্মার। আম্মারের মদীনায় হিজরতের পর তিনি হুযায়ফা ইবনে ইয়েমেনের সহিত ভ্রাতৃত্ব চুক্তিতে আবদ্ধ হন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় আনসার এবং মুহাজিরদের মধ্যে মুওয়াখাত বা ভ্রাতৃত্ববন্ধন চুক্তি নামে আনসার ও মুহাজিরদের আর একটি ভ্রাতৃত্ব চুক্তি প্রবর্তন করেন।

www.nagorikpathagar.org

হযরত আবু বাকারের খিলাফত কালে ভন্ড নবীদের বিরুদ্ধে ইয়ামামার জিহাদ সংঘঠিত হয়। আম্মার (রাঃ) এ জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে শত্রু পক্ষের তরবারীর আঘাতে তাঁর একটি কান কেটে যায়। কিন্তু দেহ রক্ষা পায়।

২১ হিজরী (৬১৪ খ্রীঃ) খলিফা হযরত উমার (রাঃ) আম্মারকে আধুনিক ইরাকের অন্তর্গত কুফা (ইরাক) প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করেন। এ সময় তিনি খুজিস্তান বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেন। হযরত আম্মারের সাথে হযরত আলীর অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। হযরত মুয়াবিয়ার সঙ্গে হযরত আলীর সংঘাতের সময় তিনি হযরত আলীর পক্ষে ছিলেন।

উম্মুল মু'মিনিন আয়েশা (রাঃ) এর নেতৃত্বে উষ্ট্রের যুদ্ধে বা জেহাদে হযরত আম্মার হযরত আলীর পক্ষে ছিলেন। এ যুদ্ধের সময় হযরত আয়েশা (রাঃ) উষ্ট্রে আরোহন করে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। উট শব্দের আরবী প্রতি শব্দ হল জামাল। হযরত আয়েশার উষ্ট্রে আরোহন করে যুদ্ধ পরিচালনার কারণে এ যুদ্ধ জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্র যুদ্ধ নামে ইতিহাসে খ্যাত।

হযরত আম্মার চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর পক্ষে সিফফীন এর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। হযরত মোয়াবিয়ার বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ সাপ্তাহিক কাল ধরে চলেছিল। এক দিনের যুদ্ধে হযরত আম্মার নিযুক্ত হন প্রধান সেনাপতি হিসেবে। এ যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রাঃ) ছিলেন অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী। হাদিস শাস্ত্রে তার দক্ষতা ছিল। হযরত আম্মারের পুত্র মুহাম্মাদও ছিলেন একজন প্রখ্যাত হাদীস শাস্ত্রবিধ।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে আত-হাইয়্যিব এবং মুতাইয়্যিব উপাধি দান করেন। হাদীসে আম্মার ইবনে ইয়াসিরের শহীদ হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইসলাম প্রচারের জন্য যে কোন ত্যাগ এবং কুরবানীতে তিনি ছিলেন সদা প্রস্তুত।

www.nagorikpathagar.org

সাহাবী সুহায়ব আর-রূমী (রাঃ)

আল্লাহর রাসূলের অতি প্রিয় সাহাবী সুহায়ব 'রূমী' নামে অভিহিত হলেও তিনি রোম বা বাইজেন্টাইন অথবা গ্রীক বা রোমান ছিলেন না। রূম ছিল তুরস্কের তৎকালীন একটি নগর। বিশ্ব বিখ্যাত সুফী সাধক জালালুদ্দীন রূমী ছিলেন এ নগরের অধিবাসী। এ নগরের অভিজাত আমীর উমরাহদের ব্যবহৃত বিশেষ ডিজাইনের লাল বর্ণের টুপিকে বলা হয় রূমী টুপি।

রোমান সাম্রাজ্য এক সময় ইটালী থেকে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এশিয়া ভূখন্ডের রোমান সাম্রাজ্যকে বলা হত বাইজানটাইন সাম্রাজ্য। এই রূম নগরী ছিল এক সময় বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী।

রূম নগরীর উল্লেখ আল-কুরআনেও আছে। সাহাবী সুহায়ব আর রূমী বংশগতভাবে ক্রীতদাস ছিলেন না। অথচ মুসলিম উম্মায় রূমী একজন ক্রীতদাস হিসেবেই সুপরিচিত।

সাহাবী সুহায়ব ছিলেন মূলত একজন আরব। তাঁর পিতা সিনান ইবনে মালিক ইবন আবদ ইবন আমর ছিলেন একজন অভিজাত আরব। ইরাকের বসরা অংশেই ছিল তাঁর নিবাস। তাঁর মাতার নাম ছিল সালমা বিনত কাইদ ইবন মাহিদ।

তৎকালে ইরাকের ইউফ্রেটিস নদীর তীরে উবুল্লা নামে একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ ও নগরী ছিল। এটা ছিল আল জাযিরা আল মাউসিল সংলগ্ন। এই জনপদের গোত্রাধিপতি বা শাসক ছিলেন সুহায়ব এর পিতা সিনান ইবনে মালিক ইবনে আবদ ইবনে 'আমর ইবনে উকাইল ইবনে আমীর, ইবনে জানদালাহ, ইবনে খুজায়মাহ, ইবনে কাব ইবনে সাদ ইবন আসলাম ইবনে আওস ইবনে যায়দ মানা ইবনুন নামির ইবনে কাসিত ইবনে রাবিয়া ইবনে নিযাব আন নামিরী। সুহায় পিতা সিনান ইবনে মালিক এর আনুগত্য ছিল পারস্য সম্রাটের প্রতি। তিনি পারস্য সম্রাটের সামন্তরাজ হিসেবেই গণ্য হতেন।

নাবিক থেকে রাজস্ব আদায়ে সুহাইব পিতা সিনান ইবনে মালিক এর প্রচুর অর্থাগম হত। ইউফ্রেটিস তীরে তিনি তৈরি করেছিলেন-বিরাট বিলাস প্রাসাদ।

সিনান ইবনে মালিক পরিবার-পরিজন নিয়ে ছিলেন মহা খুশি। তাঁর বেশ কয়েকটি সন্তান ছিল। কনিষ্ট সন্তান সুহায়ব ছিল সর্বাধিক সুন্দর, সুষমামন্ডিত এবং সকলের সুপ্রিয়। তার কেশরাজি ছিল- ঈষৎ স্বর্ণাভ। সকলের প্রিয় ছিল বলে সে ছিল প্রাণচঞ্চল,

www.nagorikpathagar.org

সক্রিয় এবং হাসি-খুশি। অতি আনন্দে দিন গুজরান হত সুহায়ব ইবনে সিনান এর তার পিতৃ পরিবারে।

একদা সুহায়ব এর মাতা তার বান্ধবী এবং পরিবার পরিজন নিয়ে আল-সানী নামে এক মরুদ্যানে প্রমোদ বিহারে গমণ করেন। নারীদের পিকনিক পার্টি হওয়ায় পুরুষের সংখ্যা ছিল স্বল্প। এতে সুহায়বের পিতা সিনান ইবনে মালিকও যোগ দেননি।

দাস জীবন শুরু

নারীদের আনন্দোচ্ছাস এবং শিশুদের কোলাহল কলরবের মাঝেই হঠাৎ বজ্রপাতের মতই আবির্ভূত হল- রোমান সৈন্যদের এক লুণ্ঠনকারী দস্যু দল। তারা প্রথমেই প্রমোদ গমণকারীদের প্রহরী এবং পুরুষদেরকে আক্রমণ করে কাবু করে নেয়। অধিকাংশই হল - নিহত। কিছু সংখ্যক হল ধৃত এবং বন্দী।

বন্দীদের মধ্যে প্রাণচঞ্চল, সুদর্শন, ৫-৬ বছর বয়সের শিশু সুহায়ব ইবনে সিনানও দস্যুদের খেলার পুতুল হিসেবে লুণ্ঠন সামগ্রীর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হল। সুহায়ব এর পিতা সিনান, লাবিদ ভগ্নি উসায়মা পিতৃব্যই বহু দেশ, বাজার, মেলায় অনুসন্ধান এবং খোঁজাখুজি করে তাকে পাননি। সুহায়ব মূল নাম ছিল উমায়রা। তবে সুহায়ব নামেই তিনি খ্যাত হয়ে যান।

বন্দীদেরকে রোমান সৈন্যগণ পথিমধ্যে বিভিন্ন দাস-বাজারে বিক্রয় করল। সুহায়বের জন্য অনেকেই উচ্চ মূল্য হাঁকল। তৎকালীন এশিয়াটিক রোমান রাজধানী ছিল কন্সটান্টিনোপল।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্সটান্টিনোপলে দেব-শিশু-রূপী সুহায়বকে চড়া দামে বিক্রয় করা যাবে ভেবে – রোমান সৈন্যদল তাকে কন্সটান্টিনোপল পর্যন্ত নিয়ে যায়।

বাইজান্টাইন রাজধানীতে শিশু সুহায়ব বহু বার ক্রয় -বিক্রয় হল। যারা শিশুটিকে দেখে, তারা গৃহের আসবাবপত্র হিসেবে অধিকতর চড়া দামে সুহায়বকে ক্রয় করতে সম্মত হয়। এভাবে বাইজান্টাইন অভিজাতদের প্রাসাদে কাজের ছেলে হিসেবে সুহায়ব বহুবার বিক্রয় এবং স্থানান্তরিত হয়।

বাইজান্টাইন ভূমিতে সুহায়ব এর শিশুকাল এবং কৈশোর কাটল। জীবনের ২০-২৫ বছর রোমান সাম্রাজ্যের অভিজাত শ্রেণীর জীবনধারা ও সংস্কৃতি অতি নিকট থেকে দেখার বিরল সুযোগ আল্লাহ্ রাব্বুল আলমীন পিতৃ-মাতৃ স্নেহ বঞ্চিত সুহায়ব এর ভাগ্যে ঘটালেন।

www.nagorikpathagar.org

শিশুকাল থেকেই সুহায়ব ছিল নেক বখ্‌ত ও সজ্জন। বাইজান্টাইন প্রাসাদের ভাগ্যহারাদের উপর, বিশেষ করে দাসদের উপর নির্যাতনের বহু করুণ দৃশ্য দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। ফলে তিনি জীবনের প্রথম অধ্যায় থেকে মানুষের প্রতি মানুষের নির্যাতন, শোষণ, অত্যাচার, অবিচারের প্রতি হয়ে উঠেছিলেন প্রকৃতিগতভাবে বিরূপ এবং বিদ্রোহী। কিন্তু রূম নগরে দাস হিসেবে গ্লানী সহ্য করা ছাড়া তাঁর করণীয় কিছুই ছিল না।

গ্রীকো-রোমান অভিজাত সমাজের এক পুঁতিগন্ধময় গ্লানী ও কদর্য সুহায়ব রুমী প্রাথমিক জীবনে পর্যবেক্ষণের মহা সুযোগ পেয়েছিলেন। সমাজের এই কদর্য চিত্র সম্বন্ধে তিনি ছিলেন হতাশ, বিরূপ এবং বিক্ষুদ্ধ।

এ সমাজের সংস্কার ও পরিচ্ছন্ন করণ সম্পর্কে তার একটি মন্তব্য ছিল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে - এরূপ সমাজকে পরিচ্ছন্ন করণে কূপের জল বা নদীর জল পর্যাপ্ত নয়। মহাসাগরের মহাপ্লাবন দ্বারাই এরূপ সমাজ সংস্কৃত পরিচ্ছন্ন হতে পারে।

ভাষা

জন্মগতভাবে সুহায়ব ছিলেন একজন আরব। কিন্তু পাঁচ বছর বয়স থেকেই তিনি অপহৃত হয়ে গ্রীক প্রভাবিত রোমান সৈন্য শিবির এবং গ্রীক সমাজে প্রতিপালিত ও বেড়ে উঠেছিলেন বলে গ্রীক ভাষায় অভ্যস্থ হয়ে উঠেছিলেন। এশিয়ান রোমান সাম্রাজ্যে মূল্য ইটালিয়ান প্রভাব অপেক্ষা গ্রীক প্রভাব ছিল অপেক্ষাকৃত অধিক।

সুহায়ব আর রূমী তাঁর মূল এবং আরব ঐতিহ্য সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। নিজেকে মরু সন্তান হিসেবেই অনেক সময় পরিচয় দিতেন। গ্রীক রোমান অভিজাত পরিবারে বিলাসীতার মধ্যে দাস হিসেবে বড় হয়ে উঠলেও বিলাসীতার উষ্ণ হাওয়া তাঁর হৃদয়কে প্রভাবিত করতে পারেনি। তিনি আজীবন সরল জীবন যাপন করতেন।

মরু জীবনের সরলতায় হারিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। দাসত্ব জীবন থেকে পলায়ণের নেশায় তিনি ছিলেন বিভোর। সুযোগ-সুবিধা বুঝে কোন এক সময় দাস যুবক সুহায়ব গ্রীকে রোমান বাইজান্টাইন বন্ধন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে পলায়ণ করেন। দীঘ সময় পালিয়ে বেড়িয়ে শেষ পর্যন্ত আরবের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য নগরী মক্কায় এসে উপনীত হন।

মক্কায় শ্রমিক জীবন

মক্কায় দাসত্ব এবং অভিজাত প্রথা থাকলেও রাজকীয় নিবন্ধন এবং কঠোর শৃঙ্খলা ছিল না। সুহায়ব ছিলেন একজন প্রতিভাবান যুবক। মক্কায় তিনি জীবিকার

www.nagorikpathagar.org

লক্ষ্যে শ্রমিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রকৃতিগতভাবে সুহায়ব ছিলেন বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ।

শ্রমিক কর্মচারী হিসেবে তিনি অভিজাত ব্যক্তিদের মন জয় করতে সামর্থ হয়েছিলেন। মক্কার কুরাইশরা তাকে দিন মজুর হিসেবে ব্যবহার না করে তাদের ব্যবসায়িক দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ে নিয়োজিত করতেন।

যুবক সুহায়বের আচরণ ছিল মার্জিত এবং ভদ্রজনোচিত। তার সুদর্শন মুখাবয়ব ও সোনালী চুলের জন্য তিনি মক্কার কুরাইশদের নিকট বিশেষ মর্যাদায় গৃহীত হন।

মক্কার একজন মহান অভিজাত কুরাইশ আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআন সুরুচিশীল সুহায়বকে বন্ধু এবং মিত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। এ সম্পর্ক ক্রমশ আনুষ্ঠানিক বন্ধুত্বে উন্নীত হয় যা 'হালিফ' নামে অবিহিত হত। হালিফেরা কোন গোত্রের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হতেন না। কিন্তু তারা চুক্তিবদ্ধ বন্ধু হিসেবে বিবেচিত হতেন এবং গোত্রীয় নিরাপত্তার আশ্রয় ভোগ করতেন।

অন্য বর্ণনায় আছে যে বনু ক্বালব গোত্রের ব্যবসায়ীগণ সুহায়বকে ক্রয় করে এনে তাকে আবদুল্লাহ ইবনে জুদআন আত-তামিমীর নিকট বিক্রয় করে দেয়। আবদুল্লাহ্ ইবনে জুদআন সুহায়ব এর যোগ্যতা ও মহত্বে মুগ্ধ হয়ে তাকে আজাদ করে দেন।

কোন গোত্রের একজন হালিফ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে আরব ঐতিহ্য মতে গোত্রের সকল লোক তার নিরাপত্তার জন্য দায়ী হত।

ব্যক্তিগত যোগ্যতা, দক্ষতা এবং গুণাবলীর জন্য সুহায়ব রুমী মক্কার সমাজে হালিফ মর্যাদায় ভূষিত হন। আব্দুল্লাহ ইবনে জুদআনের সহযোগী এবং অংশীদার হিসেবে সুহায়ব ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন এবং প্রচুর লাভ করতেন। এভাবে তিনি যথেষ্ট বিত্তশালী হয়ে উঠেছিলেন।

নবুওয়তের ঊষা

সুহায়ব পরবর্তীকালে আরবী ভাষায় জ্ঞানার্জন করলেও তাঁর উচ্চারণে গ্রীক ভাষার প্রভাব ছিল। কোন এক বাণিজ্য সফল থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সুহায়ব অবহিত হলেন যে, মক্কায় এক ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিয়ে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকছেন। ন্যায়পরায়ণ হতে এবং নেক আমল করতে উদ্বুদ্ধ করছেন। ঘৃণ্য ও লজ্জাজনক কাজ থেকে বিরত থাকতে মানুষকে উপদেশ দিচ্ছেন। এ ব্যক্তি হলেন- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্দুল মোত্তালিব আল হাশেমী।

নতুন নবী সম্পর্কে অবহিত হয়ে সুহায়ব তাঁর সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেয়া আরম্ভ করলেন। সুহায়ব আরব সমাজে অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর বন্ধু

www.nagorikpathagar.org

বাঁন্ধব তাকে নতুন নবী সম্বন্ধে উৎসাহী হতে বারণ করলেন। কারণ, মক্কার কুরাইশগণ এবং নবীর বংশোদ্ভুত লোকজনও তাকে পছন্দ করছে না। বরং তারা নতুন নবীর অনুসারী ও সমর্থকদেরকে নির্যাতন করছে।

সুহায়ব মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ এবং আরও খোঁজ খবর নেয়া শুরু করলেন। ব্যক্তিগত শুভাকাংখীদের সতর্ক বাণী তার ঔৎসুক্যের উত্তাপ প্রশমিত করতে পারেনি। যতটুকু সম্ভব অবহিত হয়ে তাকে আরও দেখা ও জানার আগ্রহী হয়ে উঠলেন।

তিনি (সুহায়ব) খবর পেলেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কুরাইশ আল- আরকাম ইবনে আবি আল- আরকামের গৃহে আবস্থান করেন। খবরদাতারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সঙ্গে পরিচয়ের ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কেও তাকে সাবধান করে দিল। কারণ সুহায়ব ছিল- অনারব এবং বিদেশী।

"আসাবিয়া" বা সাথি হিসেবে গভীর চুক্তিবদ্ধ বন্ধন যদি কোন ব্যক্তির না থাকে– আরব সমাজে তার নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হত। বন্ধুত্ব বা চুক্তিবদ্ধ ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক যুক্ত ব্যক্তিত্ব সুহায়বের ছিল না। বিপদের সময় আঘাত প্রতিরোধক ঢাল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এমন কোন গোত্রীয় সাহায্য পাবার সম্ভাবনাও তাঁর ছিল না।

আল-আরকাম ভবনে

তবুও কি এক অপূর্ব এবং অব্যক্ত আকর্ষণে সুহায়ব সতর্ক পদক্ষেপে আল-আরকাম গৃহের দিকে রওয়ানা হলেন এবং আল-আরকাম গৃহে সুহায়ব পৌছলেন। কক্ষ দ্বারে পেলনে আম্মার ইবনে সুমাইয়্যা (রাঃ) ও ইয়াসিরকে।

সাহাবী আম্মারের সঙ্গে সুহায়বের পূর্ব পরিচিত ছিল। আম্মার ছিলেন প্রাথমিক ইসলামের ইতিহাসের প্রথম শহীদ সুমাইয়্যা ইয়াসির দম্পতির পুত্র। সাহাবী ইয়াসিরের পূর্বপুরুষেরা ছিল ইয়ামেনী।

সাহাবী আরকাম গৃহের দ্বারে আম্মারকে পেয়ে সুহায়ব উৎসাহিতবোধ করলেন। কারণ আম্মার ছিল তাঁর পরিচিত।

আম্মারের দিকে অগ্রসর হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আম্মার! তুমি এখানে কী উপলক্ষ্যে ?" আম্মারও সুহায়বকে আরকাম গৃহ দ্বারে উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। পারস্পরিক উদ্দেশ্য জানার লক্ষ্যে কিছুটা দর কষাকষির পর সুহায়ব বলেই ফেললেন–যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর নবী বলে পরিচয় দিচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসেছি। জবাব শুনে আম্মারও স্বীকার করলেন যে আরকাম গৃহ দ্বারে তার আগমনও একই উদ্দেশ্যে। অতঃপর দুজনেই একসঙ্গে আরকাম গৃহে প্রবেশ করলেন।

www.nagorikpathagar.org

আরকাম গৃহে সুহায়ব এবং আম্মারের প্রবেশের পূর্বেও কয়েক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাদের সম্মুখে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দ্বীনের বাণী বিশ্লেষণ করছিলেন। দু'জনেই শ্রোতাদের সঙ্গে মিশে গেলেন। কিছুক্ষণ শুনার পর তাদের হৃদয় ঈমানের আলোকচ্ছটায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

অগ্নী পরীক্ষা

রাসুল (সাঃ) এর বাণী শ্রবণের পর আম্মার এবং সুহায়ব এক সঙ্গে আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাওহীদের শাহাদাৎ দিলেন। রাসূলের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিলেন তারা দু'জনেই। সারাটা দিন তারা রাসুলুল্লাহর সংসর্গে কাটালেন।

সুহায়ব ও আম্মার বিভিন্ন বর্ণনা মতে প্রাথমিক ২১ অথবা ৩৩ জনের পর ইসলাম কবুল করেন। মুজাহিদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে যারা মুসলিম নামে পরিচিত ছিলেন তাদের ৭ এর পর সুহায়ব ইসলাম কবুল করেন।

রজনীর অন্ধকারে তারা আরকাম গৃহ পরিত্যাগ করেন। তাদের হৃদয় ছিল ঈমানের আনন্দে উদ্বেল। তৌহিদের চেতনায় সমুজ্জ্বল। নও মুসলিম সাহাবী সুহায়ব এবং আম্মার ছিলেন- সুখি এবং বিমুগ্ধ।

সুহায়বের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রইল না। মুর্তিপূজারী কুরাইশগণ এ বিষয়ে যথাসময়ে অবহিত হল। তারা সকল আক্রোশ নিয়ে সুহায়বের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বিলাল, খাব্বার, সুমাইয়া, আম্মার, ইয়াসির, আবু ফাইদ, আমির ইবন ফুহায়রা প্রমুখের ন্যায় সুহায়ব যদিও মক্কায় কারোর ক্রীতদাস ছিলেন না, তবু তাঁর উপর নির্যাতনের মাত্রা বিন্দুমাত্র কম ছিল না। তাদের সম্বন্ধে কুরআনের এ আয়াত নাজিল হয় - "যারা নির্যাতিত হবার পর হিজরত করে ও ধৈর্য্য ধারণ করে তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" দিনের পর দিন সুহায়ব এর উপর কুরাইশদের অমানসিক অবমাননা ও দৈহিক নির্যাতন অব্যাহত রইল।

সুহায়ব আর রুমী ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। ধৈর্য্য ছিল তার অপরিসীম। ঈমান ছিল অগাধ, সুগভীর। জান্নাতের প্রত্যাশা ছিল তীব্র। তাই তাঁর পক্ষে কুরাইশদের অত্যাচার, নির্যাতনের ব্যথাও ক্রমশঃ সহনীয় হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর রাসূলের শিক্ষা এবং প্রেরণা তাকে দিয়েছিল ধৈর্য্য ও সহনশীলতার অপরিমেয় শক্তি। হিজরত পর্যন্ত এ নির্যাতন চলেছিল।

www.nagorikpathagar.org

মদীনায় সুহায়ব আর- রূমী (রাঃ)

সাহাবী সুহায়ব আর-রুমী ছিলেন একজন আরব। উর্ধ্ব ইরাকে ইউফ্রেটীস নদীর তীরে বর্তমান মওসুল সংলগ্ন জনপদের ইরানীয়ান শাসক ছিলেন সুহায়বের পিতা সিনান ইবন মালিক। তিনি ছিলেন পারস্য সম্রাটের একজন সামন্তরাজ। সিনানের মাতা আল সামী নামক এক মরুদ্যানে আনন্দ বিহারে থাকাকালে রোমান সৈন্যদের এক লুণ্ঠনকারী দল সুহায়বকে লুণ্ঠন করে এশিয়ান রোমান সম্রাজ্যের রূম নগরীতে বিক্রয় করে দেয়।

বহুবার ক্রয় -বিক্রয় ও হাত বদলের পর সুহায়ব রূমী তাকদীরের টানে মক্কায় চলে আসেন। কথিত আছে যে বানু কালব গোত্রের ব্যবসায়ী দল তাকে মক্কায় সর্বশেষে আব্দুল্লাহ ইবন জুদআন তামিমীর নিকট বিক্রয় করে দেয়। ইসলাম গ্রহণের পর আব্দুল্লাহ ইবন জুদআন সুহায়বের যোগ্যতা ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে তাকে আজাদ করে দেন।

রিক্ত হস্তে হিজরত

ব্যবসা-বাণিজ্য করে হজরত সুহায়ব প্রচুর বিত্ত সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। কুরাইশগণ ভয় করল যে, সুহায়ব তার সোনা-চাঁদিসহ মদীনায় গিয়ে মুসলিমদের আর্থিক শক্তি বৃদ্ধি করবে। তাই তারা সুহায়বের পিছনে সার্বক্ষণিক পাহারাদার নিযুক্ত করল।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মদীনা হিজরতের পর সুহায়ব সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি মদীনায় চলে যাবেন। তার ভাবভঙ্গী এবং দ্রব্য সামগ্রী ব্যবস্থাপনায় কুরাইশদের এ সন্দেহ ঘনীভূত হল।

তাদের এ পাহারা শুধু দিনের বেলা নয়, রাতের বেলায়ও থাকত এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে। অগত্যা হযরত সুহায়ব তাঁর বিত্ত সম্পদ পিছনে ফেলে রেখে রিক্ত হস্তে রাসূলুল্লাহর সম্মুখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু সার্বক্ষণিক প্রহরীদের সতর্ক দৃষ্টি এড়াতে পারলেন না।

www.nagorikpathagar.org

কৌশল

অবশেষে সুহায়ব মক্কা ত্যাগের জন্য শত্রুকে ফাঁকি দেয়ার কৌশল সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করলেন। এক তীব্র শীতের রাত্রিতে তিনি ভান করলেন যে, তাঁর সাংঘাতিক ধরণের পেটের অসুখ হয়েছে। বার বার তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য গৃহ হতে বেশ দূরত্বে যেতে লাগলেন। প্রহরীরাও সাথে সাথে যেত। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে তিনি সটাং বিছানায় পড়ে পীড়িত ব্যক্তির ন্যায় হাফাতেন।

সুহায়ব-এর করুণ অবস্থা দেখে প্রহরীরা হাফ ছেড়ে বাঁচল। তারা নিজেদের মধ্যে বলা-বলি করতে লাগল যে দেবী আল-লাত এবং আল- উয্যার অভিশাপ সুহায়বের উপর পড়েছে। তাঁর পক্ষে আর পালান সম্ভব নয়। প্রকৃতির ডাকাডাকি তাকে ব্যস্ত রাখবে।

গভীর রাতে তাঁর ঘরে এবং বাইরে দৌড়াদৌড়িতে প্রহরীরা তাদের প্রহরা শিথিল করে ফেলেছিল। প্রহরীরা কিছুটা দায়িত্বভার মুক্ত অনুভব করল। এক পর্যায়ে তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

পাশ্চাত-ধাবণ

সুযোগ বুঝে সামান্য অস্ত্র, তীর এবং ধনুক নিয়ে তার প্রিয় এবং দ্রুতগামী অশ্বটিতে সুহায়ব আরোহণ করে বসলেন। বাতাসের ন্যায় তীব্র গতিতে মরুর উপর দিয়ে ঘোড়া হাকিয়ে চললেন।

অল্প সময় পর প্রহরীরা জেগে উঠে সুহায়বকে ডাকাডাকি করল– কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। তারা সন্দেহ করল যে, সুহাইব পেটের অসুখের আড়ালে তাদেরকে ধোকা দিয়ে পালিয়েছে। তারাও দ্রুতগামী অশ্বে আরোহন করে সুহায়বের পিছু নিল। রজনীর অন্ধকার তিরোহিত হওয়ার পর এক পর্যায়ে তারা সুহায়বকে প্রায় ধরেই ফেলল।

বিপদ এত নিকটে দেখে এবং দূরবর্তী পাহাড়াটিকে লক্ষ্য স্থির করে সুহায়ব অশ্বের গতি বাড়িয়ে দিলেন। শত্রুরাও পিছু ছাড়ল না। পাহাড়ের কাছে পৌছে সুহায়ব তাঁর প্রিয় অশ্বটি ছেড়ে দিয়ে উঁচু শিলা-গীরি বাইতে লাগলেন। হাতে তরবারী ও বর্শা ছাড়াও সাথে ছিল বেশ কিছু সংখ্যক তীর এবং মজবুত একটি ধনুক।

শত্রুরাও শিলা পাহাড়ে তাকে অনুস্মরণ করছিল। যখন তারা অতি নিকটে এসে গেল, সুহায়বও একটি শিলার আড়ালে দাঁড়িয়ে শত্রুদেরকে বলল- "হে

www.nagorikpathagar.org

কুরাইশবৃন্দ!

তোমরা যুদ্ধে আমার সুখ্যাতির বিষয় জান। আমি মক্কার তীরন্দাজদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। লক্ষ্যে পৌঁছতে আমার তীর কখন ভুল করে না। তোমরা যদি আর কাছে আস– আমার একটি তীরও ভুল করবে না। প্রতি তীরে আমি একজন করে শত্রু খতম করব। আমার তুনির তীর শেষ হয়ে গেলে হাতে তো থাকবে ধারালো তলোয়ার। আমার তরবারির ধার সম্পর্কেও তোমাদের কিছুটা ধারণা আছে।

নিরাপত্তা ক্রয়

তাকে অনুসরণকারী কুরাইশ দলপতি বলল- দেবতার কসম ! তোমার জীবন এবং অর্থ নিয়ে পালিয়ে যেতে তোমাকে আমরা দেব না। যখন মক্কায় এসেছিলে তুমি ছিলে কপর্দকহীন, নিঃস্ব এবং অসহায়। মক্কায় থেকেই তুমি প্রচুর বিত্ত সম্পদের অধিকারী হয়েছে। এ সম্পদ মক্কাবাসীদের।

কুরাইশদের ঘোষণার জবাবে সুহায়ব বললেন- এটাই যদি হয় তোমাদের বক্তব্য - তবে আমার কথা শোন। আমি যদি আমার সমস্ত সম্পদ তোমাদেরকে দান করে দি, তাহলে কি তোমরা আমার গমণ পথ থেকে সরে দাঁড়াবে?

এ প্রস্তাবে কুরাইশ অনুসারীগণ আনন্দ উল্লাসে চিৎকার করে উঠল এবং তাদের পূর্ণ সম্মতি জানাল। সুহায়ব তখন মক্কায় কার নিকট তার অর্থ সম্পদ গচ্ছিত আছে এবং কি পরিমাণ আছে তাও অবহিত করল। তাঁর পশ্চাৎ নিজস্ব সম্পত্তি কি আছে তারও বিস্তারিত বিবরণ দিল। তাঁর গৃহে এবং অন্যত্র কি পরিমাণ সোনা-চাঁদি গচ্ছিত আছে তাও জানাল। এ সকল সম্পদ সব তিনি তাঁর অনুসারী কুরাইশদেরকে দানের ঘোষণা দিলেন। তারা স্বনন্দে সুহায়বকে কপর্দক অবস্থায় রিক্ত হস্তে মদীনায় যাওয়ার সুযোগ করে দিল। (ইবনে সাদ, তাবাকাত, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২২৭-২২৮)।

মুক্তির নিশ্বাস

কুরাইশদের প্রস্থানের পর বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে সুহায়ব মদীনার পথে তাঁর অশ্ব ধাবিত করলেন। মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিনি উল্কার বেগে মদীনায় মহানবীর (সাঃ) সান্নিধ্যে এসে পৌঁছলেন।

সুদীর্ঘ পথে দ্রুতবেগে অশ্বারোহনের ফলে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু প্রিয় নবীর সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়টি মানসপটে উদিত হলেই তিনি সুপ্ত হয়ে শক্তি ফিরে পেতেন এবং অধিকতর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মদীনার দিকে অগ্রসর হতেন।

www.nagorikpathagar.org

সুদীর্ঘ সফরের পর ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, রিক্ত সুহায়ব মদীনার অদুরে কুবা পল্লীতে উপস্থিত হলেন। এই কুবাতেই হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ উষ্ট্রি থেকে অবতরণ করেছিলেন এবং মদীনায় প্রবেশের পূর্বে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন।

মহানবীর সঙ্গে মিলন

কুবাতে এসে রাসূললুল্লাহর মনে হয় সুহায়বের অপেক্ষায়ই ছিলেন। তিনি সহাস্য বদনে মুক্ত হস্তে প্রিয় সঙ্গী সুহায়বকে বরণ করে নিলেন। তিনি সুহায়বকে সম্বোধন করে বললেন – তোমার ব্যবসা ফলপ্রসু হয়েছে, তুমি সফলকাম। হে আবু ইয়াহিয়্যা! আল্লাহর সঙ্গে তোমার ব্যবসায়ে তুমি লাভবান হয়েছ। এ বাক্য তিনি তিন বার উচ্চারণ করলেন।

রাসূলুল্লাহর আশ্বাস বাণী শুনে সুহায়বের ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তি সব কিছু তিরোহিত হল। তাঁর বদন মন্ডল সফলতার আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনিও (সুহায়ব) আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করলেন–"হে আল্লাহর রাসুল ! আমার পূর্বে কেউ মক্কা থেকে আপনার নিকট এসে পৌছায়নি। শুধু জিব্রাইল (আঃ) এ বিষয়ে আপনাকে সঠিক তথ্য দিতে পারে।"

সুহায়বের এ কথাটিও সত্যে প্রমাণিত হয়েছিল। আল্লাহর সঙ্গে সুহায়বের ব্যবসায়ে ফলপ্রসু হয়েছে এর সত্যতা জিব্রাইল (আঃ) এর মাধ্যমেই প্রত্যয়ণ করা হয়েছে। নাযিল হয়েছে আল্লাহর এই বাণী "এমন এক ধরণের মানুষও আছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদেরকে আল্লাহর রাস্তায় বিক্রয় করে দেয়। আল্লাহ এরূপ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াপ্রবণ।" (সূরা বাক্বারা-২ঃ২০৭)

খাঁটি ঈমানদারদের নিকট অর্থ, বিত্ত, সোনা-চাঁদ ঈমানের তুলনায় গুরুত্বহীন এবং অর্থহীন। আল্লাহর রাসূলের জন্য ভালবাসায় প্রিয় সাহাবী সুহায়বের হৃদয় ছিল পরিপূর্ণ। তাই অর্থের মায়া ও আকর্ষণ তাকে মক্কায় থাকতে দেয়নি। সব কিছু ছেড়ে মদীনায় টেনে নিয়ে এসেছিল।

সাহাবী সুহায়ব মদীনায় হিযরতের পর আনসার সাদ ইবনে খায়সামার আতিথ্য বরণ করেন। পরে তিনি হারিস এর সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হন।

খলিফা উমারের মূল্যায়ন

একদিন সকাল বেলা ফজরের নামাজ পড়াবার সময় পারস্যদেশীয় খৃষ্টান ক্রীতদাস আবু লুলু হযরত উমরকে আক্রমণের লক্ষে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাকে ছোরা দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করে। তিনি এত বেশি আহত হয়েছিলেন যে, জ্ঞান

www.nagorikpathagar.org

না হারালেও তিনি তাঁর ইন্তেকাল যে আসন্ন তা অনুভব করেছিলেন।

হযরত উমর (রাঃ) তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে কাউকে মনোনীত করে যাননি। শুধুমাত্র ওয়াছিয়্যত করেছিলেন যে -তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে যেন খলিফা মনোনীত না করা হয়। তাঁর মতে খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য এক বংশের এক ব্যক্তিই পর্যাপ্ত। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার মত বহু গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন- আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)।

হযরত উমর যে ৬জন সাহাবীকে খলিফা মনোনীত করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তারা হলেন - (১) হযরত উসমান (রাঃ) (২) আলী (রাঃ) (৩) তালহা (রাঃ) (৪) জোবায়ের (রাঃ)। (৫) আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)। এরা সকলেই ছিলেন আল্লাহর রাসুলের অতি ঘনিষ্ট ও মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী।

হযরত উমার সাহাবীদের মধ্য হতে ছয়জনকে জনগণের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর মৃত্যুর তিন দিনের মধ্যে উত্তরাধিকারী নির্বাচনের জন্য সুপারিশ করতে আদেশ দিয়েছিলেন। আর নির্দেশ দিয়েছিলেন যে – তাঁর পর রাসূলুল্লাহর প্রিয় সাহাবী সুহায়ব আর্ রুমি সালাতে ইমামতি করবেন। তদনুযায়ী তিন দিন সুহায়ব (রাঃ) সালাতে ইমামতি করেন। (ইসাবা ; ২য় খন্ড, পৃঃ ৯৫)।

মদীনায় সাধারণত সালাতে খলিফা ইমামতি করতেন অথবা তার মনোনীত কোন ব্যক্তি সালাতে ইমামতি করতেন। যে কোন জামায়াতের আমীর সাধারণত দলের ফরজ সালাত পরিচালনা করে থাকেন। যিনি সালাত পরিচালনা করে থাকেন, তাকেই আমীর হিসেবে গণ্য করা হয়।

হযরত উমরের অসুস্থতার সময় সাহাবী সুহায়বকে সালাতের আমীর মনোনীত করার একটি তাৎপর্য হল – তিনি এ সময় ছিলেন ভারপ্রাপ্ত আমীর, খলিফা। এর দ্বারা মুসলিম সমাজে হযরত সুহায়বের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি বেশ কিছুটা প্রতিফলিত হয়।

মুসলিম সমাজে ক্রীতদাসদের মর্যাদা

মুসলিম সমাজে ক্রীতদাসদের সামাজিক ও মানবিক মর্যাদা কোন দিক দিয়েই ক্ষুন্ন বা হীন ছিল না। একদিন হযরত সালমান ফারসী (ইরানীয়ান) সুহায়ব রূমী (বাইজান্টাইন) এবং বিলাল আল (হাবশী) খাব্বাব আল আরাথাত, আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রাঃ) এক জায়গায় বসে কোনো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। কায়েস ইবনে মুতাতিয়া (রাঃ) নামক একজন মুনাফিক তথায় উপস্থিত হয়ে মন্তব্য করেন – "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বুদ্ধি-পরামর্শ দেয়া এবং তাঁর সমর্থনে অগ্রবর্তী হওয়ার জন্য তো আউস এবং খাজরাজ গোত্রই আছে। এ সমস্ত লোকদের

www.nagorikpathagar.org

তাঁর কি প্রয়োজন?

কায়েস ইবনে মুতাতিয়ার এ হেন উদ্দেশ্য মূলক বক্তব্য শ্রবণে সাহাবী মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং অগ্নীশর্মা হয়ে উঠেন। তিনি রাসূলুল্লাহকে কায়েস ইবনে মুতাতিয়ার মন্তব্যের বিষয়টি অবহিত করেন। এ অভিমত শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। তিনি মসজিদে প্রবেশ করে আযানের নির্দেশ দিলেন।

সালাতের সময় আযান দেয়া হয় সালাতে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানানোর জন্য। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনার নোটিশ হিসেবে আযান দেয়া হয়। মসজিদে লোকজন সমবেত হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দাঁড়ালেন, আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং ঘোষণা করলেন–"তোমাদের রাব্ব এক এবং একক। তোমাদের পূর্ব পুরুষ (আদম) একজন। তোমাদের দ্বীন একটি। বিষয়টির সম্পর্কে সতর্ক হও। তোমাদের পিতামাতার মাধ্যমে 'আরবতা' তোমদের উপরে অর্পন করা হয় না। এটা অর্পিত হয় জিহ্বা বা রসনা (আরবী ভাষা) এর মাধ্যমে। সুতরাং, যে আরবী ভাষায় কথা বলবে সেই একজন আরবী।

www.nagorikpathagar.org

সালিম মাওলা আবি হুজায়ফা (রাঃ)

এক রজনীতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আয়শার (রাঃ) কক্ষে ছিলেন। ইশায় নামাজ শেষ করে কক্ষে ফিরতে বিবি আয়েশা (রাঃ) অনেক দেরী করেন। রাসূলুল্লাহ দেরীর কারণ জিজ্ঞাসা করলে। বিবি আয়েশা জানালেন যে তিনি একজন ক্বারীর সুললিত কণ্ঠের কুরআন তিলাওয়াত শুনছিলেন। তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াতের উচ্চসিত প্রশংসা তিনি করলেন।

বিবি আয়শার প্রশংসা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) গায়ে চাদর দিয়ে বাইরে আসলেন। দেখলেন ঐ তিলাওয়াতকারী ছিলেন সালিম মাওলা আবি হুজায়ফা ইবনে উৎবা।

তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন– "সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার। তিনি তোমার মত ব্যক্তিকে আমাদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন (হায়াতুস সাহাবা, ৩খ; ৯৬ঃ ইসাবা, ২-খ, পৃঃ -৭; উসদুল গাবা, ২-খ, পৃঃ ২৪৫)।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন চার ব্যক্তির কাছ থেকে তোমরা কুরআন শিক্ষা লাভ কর। এরা হলেন (১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসূউদ (২) সালিম মাওলা আবি হুজায়ফা ইবনে উতবা ইবন রাবিয়া (৩) উবাই ইবনে ক্বা'ব (রাঃ) (৪) মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ)।

রাসূলুল্লাহর (সাঃ) দৃষ্টিতে আল-কুরআন চর্চায় সালিম (রাঃ) অতি উচ্চ মর্যাদায় আসীন ছিলেন। তিনি মুসলিমদেরকে সালিমের নিকট থেকে কুরআন শিক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। হযরত সালিম ইবন আবু হুজায়ফাকে ক্বিরাতের ইমাম বিবেচনা করা হত। তিনি ছিলেন আল-কুরআনের হাফিজ।

মুহাজির নেতা সালিম (রাঃ)

মক্কা হতে মদীনায় আগত মুহাজিরদের নেতৃত্বে ছিলেন সালিম (রাঃ)। কুবার মসজিদে হযরত উমার (রাঃ), আবু সালিম ইবন আবদুল আসাদ (রাঃ) এর ন্যায় বড় বড় সাহাবীর উপস্থিতিতে সালিম (রাঃ) নামাজে ইমামতি করতেন। তাদের সকলের মধ্যে তিনি ছিলেন কুরআন সম্পর্কে সর্বাদিক জ্ঞাত (বুখারী, উসদুল গাবা, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৪৫)। রাসূলুল্লাহ্র পূর্বেই তিনি মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় তিনি আববাদ ইবনে বিশরের আতিথ্য গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্র হিজতের পর তিনি তাঁর নির্দেশে মুয়াজ ইবনে মাইস এর সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হন।

www.nagorikpathagar.org

ক্রীতদাস

সালিমের পিতার নাম উবায়দ ইবন রাবিয়া। তাঁর জন্ম পারস্যের ইসতাখর প্রদেশে। প্রথম জীবনে সালিম ছিলেন আবু হুজায়ফার স্ত্রী ছুবায়তা বিনতে রাবিয়া আনসারীর ক্রীতদাস। আবু হুজায়ফার স্ত্রী ছুবায়তা তাঁর এ ক্রীতদাসের প্রতি এত সন্তুষ্ঠ ছিলেন যে তাকে বিনা শর্তে আজাদ করে দেন।

সালিম (রাঃ) মৃত্যুর সময় তাঁর সম্পত্তি বন্টনের ওয়াছিয়্যত করে যান। এতে ছিল এক তৃতীয়াংশ দ্বীনি কাজে ব্যয় হবে, এক তৃতীয়াংশ গোলাম আজাদ করার জন্য ব্যবহার হবে এবং এক তৃতীয়াংশ পাবে তার পূর্ববর্তী মালিকা ছুবায়তা।

হযরত আবু বাকার (রাঃ) তাঁর ওয়াছিয়্যত অনুসারে সালিম (রাঃ) এর পূর্ববর্তী মালিকা এবং আবু হুজায়ফার পত্নী ছুবায়তা বিনতে রাবিয়ার নিকট এক তৃতীয়াংশ পাঠিয়ে দেন।

আবু হুজায়ফার পত্নী ছুবায়তা এ অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে জানান যে তিনি কোন কিছু প্রাপ্তির আশা ছাড়াই সালিমকে আজাদ করেছিলেন।

ক্রীতদাস থেকে পালক পুত্র

সালিম ইবন হুজায়ফার সঙ্গে যায়েদ ইবনে হারিছার ঘটনার কিছুটা মিল আছে। হযরত খাদিজাতুল তাঁর ক্রীতদাস যায়েদকে উপহার হিসেবে প্রদান করেন স্বামী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে। তিনি তাকে আজাদ করে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। ছুবায়তার স্বামী আবু হুজায়ফা (রাঃ) ও সালিমকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন।

আবু হুজায়ফা (রাঃ) সালিমকে খুব ভালোবাসতেন এবং স্নেহ করতেন। তিনি তাঁর নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রী ফাতিমা বিনতুল ওয়ালিদ ইবনে উতবাকে সালিমের সঙ্গে বিবাহ দেন। তাদের কোন সন্তান সন্ততি ছিল না।

হুজায়ফা ইবনে উতবা ইবনে রাবিয়া কর্তৃক মুক্ত দাস পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করার পর তিনি সালিম ইবন আবি হুজায়ফা নামে পরিচিত হন। ইসলাম গ্রহণের পর রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে আবু উবায়দাহ ইবনে জাররাহ এর সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে দেন।

মাওলা

এক সময় ইসলামে দত্তক প্রথা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। রাসূল করিম (সাঃ) এর দত্তক পুত্র যায়েদের নাম ছিল যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ। দত্তক প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার পর তাঁর নাম হল যায়েদ ইবনে হারিছা। হারিছা ছিল যায়েদের প্রকৃত জনক। সালিম (রাঃ)

www.nagorikpathagar.org

তাঁর পালক পিতা আবু হুজায়ফার মাওল (আশ্রিত) নামে পরিচিত হন। কারণ পিতৃ পরিচয় অপেক্ষা তাঁর অকৃত্রিম ভাই বন্ধু এবং পিতারূপী আবু হুজায়ফাকেই বেশী আলোবাসতেন। গোলাম মালিকের এ ধরণের সম্পর্ক মানব ইতিহাসে বিরল।

মাওলা শব্দটির একাধিক অর্থ আছে। মাওলা শব্দের অর্থ প্রভু। মাওলা শব্দের অপর অর্থ হয় আশ্রিত বা রক্ষিত ব্যক্তি। এমন লোককেও মাওলা বলা হত, যারা মূলতঃ ছিল দাস এবং পরবর্তীতে কোন গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতেন।

পালক-পুত্র প্রথা রহিত হওয়ার পর সালিম পরিচিত হলেন আবু হুজায়ফার মাওলা সালিম নামে। অর্থাৎ আবু হুজায়ফার আশ্রিত বন্ধু সালিম হিসেবে। হুজায়ফা ছিলেন অত্যন্ত সুশীল নেক বখত্ মানুষ। তিনি সালিমকে তার মাওলা বা আশ্রিত বা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে সালিম ছিলেন একজন সফল কর্মী পুরুষ। তিনি স্বীয় প্রতিভা বলে মুসলিম সমাজে সর্বোচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হন। তাঁর ধর্মপরায়নতা ও মানবীয় গুণসমূহ ছিল সেকালে বিরল প্রকৃতির।

সালিম এবং তাঁর পালক পিতা আবু হুজায়ফা প্রায় একই সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। আবু হুজায়ফার পিতা ওতবা ইবনে আর রাবিয়া ছিল অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির লোক। তার একটি বদ অভ্যাস ছিল। আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে কথা বলা কারণে এবং অকারণে। তাঁর পুত্র আবু হুজায়ফা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। পিতার নিষেধাজ্ঞা এবং অমানবিক নির্যাতন সত্ত্বেও আবু হুজায়ফা ইবনে ওতবা ইবনে রাবিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন।

বদর যুদ্ধে আবু হুজায়ফা (রাঃ) স্বীয় পিতা উৎবা ইবনে রাবিয়াকে দ্বন্দ যুদ্ধে আহ্বান করেন। এ জন্যে তার ভগ্নি আবু সুফিয়ান পত্নী হিন্দা তাকে লক্ষ্য করে একটি তিরস্কার ও ভৎসনা সূচক কবিতা রচনা করে।

আবু হুজায়ফার পিতা উতবা, ভ্রাতা ওয়ালিদ এবং পিতৃব্য শায়বা বদর যুদ্ধে কুরাইশ পক্ষে যোগ দেয় এবং নিহত হয়। আবু হুজায়ফা (রাঃ) ছিলেন বদর যুদ্ধের মুসলিম পক্ষে। আবু হুজায়ফার ভগ্নী ছিলেন আবু সুফিয়ান পত্নী হিন্দা। সালিম বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যেহাদে অংশগ্রহণ করেন এবং বিরাট ত্যাগ, কুরবানী ও বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

ভ্রাতৃত্ব

সালিম এবং আবু হুজায়ফার মধ্যে ভাতৃত্বের বন্ধন মৃত্যু পর্যন্ত অটুট ছিল। তারা শুধু পরস্পর ভাতৃ স্বরূপই ছিলেন না। ছিলেন তারও বহু উর্ধ্বে।

www.nagorikpathagar.org

একজন দাসকে প্রথমে পালক পুত্র, পরবর্তীতে ভাতৃ বন্ধনে আবদ্ধ করে আবু হুজায়ফা (রাঃ) যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা ছিল অনুপম এবং অনুকরণীয়।

ইসলাম সমাজে ভূয়া মর্যাদাগত শ্রেণী বিভাগ বিলোপ সাধন করে, আদমের আওলাদকে একই স্তরে উন্নীত করতে অবদান রাখে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব হল - তার গুণাবলী ও নেক আমল। জন্ম ও বর্ণগত শ্রেণী বিভাগ ইসলামে স্বীকৃত হলেও গুরুত্বপূর্ণ নয়। আবু লাহাব এবং আবু জাহাল এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঈমানদারী, ত্যাগ, সততা, কুরবানী, ইত্যাদি বহুবিধ গুণাবলীর মাধ্যমে সালিম মুসলিম সমাজে অতি উন্নত মর্যাদায় আসীন হন।

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ সাক্ষাৎ হলেই সালিমকে বলতেন 'সালিম মিনআস সালেহীন।" সালেহীন এবং মুত্তাকীনদের মধ্যে সালিম একজন।

মাওলা, দাস এবং দরিদ্রদের মধ্যে এমন বহু ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল, যারা সমাজ ও সভ্যতায় অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন।

স্পষ্ঠভাষী সালিম

প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ সালিমের নাম দিয়েছিলেন "সালিম মিনাস সালেহীন।" সালিমের গুণাবলীর মধ্যে একটি ছিল তাঁর - স্পষ্টবাদীতা। সালিম কথা বলতেন কম। কিন্তু অন্যায় প্রতিরোধে তার কণ্ঠস্বর ছিল অতি বলিষ্ঠ।

যখন কথা বলা প্রয়োজন, বিশেষ করে অন্যায়ের প্রতিরোধ করা সালিম নিজের কর্তব্য মনে করতেন, তখন কখনও তিনি নীরব থাকতেন না।

পৌত্তলিকদের হাত থেকে মক্কা বিজয়ের পর একটি সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটে। সাহাবীদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কার চারিদিকে দাওয়াতি মেহনতের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তাদের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে, যুদ্ধ করে বিজয় নয় বরং দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে জনগণের হৃদয় জয় করে নেয়াই হবে তাদের লক্ষ্য এবং কর্তব্য।

দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে প্রেরিত দা'ঈ দলের একটিতে ছিলেন – বীর সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ। এরূপ একটি দাওয়াতি অভিযান কালে একজন পূর্ব শত্রুর মুখোমুখি হন খালিদ (রাঃ)। তিনি তখন ছিলেন একজন নও-মুসলিম। অজ্ঞতাযুগের স্মৃতি তাঁর মানসপটে ভেসে উঠে। তিনি পূর্ব শত্রুতার জের টেনে তাকে আক্রমণ করেন এবং হত্যা করে বসে। যদিও লোকটি নিজেকে মুসলিম বলে বার বারই ঘোষণা দিচ্ছিল।

ঐ মিশনে দাওয়াতি অভিযানে অন্যান্যদের সঙ্গে সালিমও ছিলেন। খালিদের কান্ড দেখে তিনি দ্রুত তাঁর দিকে অগ্রসর হন এবং তাকে তীব্র ভৎসনা করেন।

www.nagorikpathagar.org

সালিমের তিরস্কার ও ভৎসনা বাক্যে খালিদ (রাঃ) স্তব্ধ হয়ে যান।

খালেদ ছিলেন মহাবীর। বীরত্বের স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন শুধু অজ্ঞতার যুগে নয়, ইসলাম গ্রহণ করার পরও।

সালিমের ভৎসনা বাক্যের তীব্র কষাঘাতে আহত খালিদ (রাঃ) আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেছিলেন। অকুতোভয় সালিম খালিদের বীরত্বের প্রতি বিন্দুমাত্র সমীহ না করে তাঁর ত্রুটি বিচ্যুতি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন।

সালিম (রাঃ) কী ভেবেছিলেন যে, তিনি একজন কুল গোত্রহীন দাস এবং খালিদ ছিলেন মক্কার কুরাইশের অন্যতম। বরং সালিমকে মনে হয়েছিল ন্যায়ের পক্ষ থেকে আক্রমণকারীর ভূমিকায়। তাঁর স্বপক্ষীয় শক্তি ছিল সত্য, ন্যায় এবং সুবিচার। খালিদকে তিনি মহাশক্তিধর সেনাপতি হিসেবে না দেখে একজন অপরাধী হিসেবে গণ্য করেছেন এবং অপরাধীর প্রতি তাঁর যা দায়িত্ব এবং কর্তব্য তা নির্ভিকভাবে পালন করেছেন।

খালিদের প্রতি সালিমের ছিল না কোন ব্যক্তিগত ঘৃণা, আক্রোশ ও বিরোধিতা। বরং তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল আন্তরিকতা, দৃঢ়তা এবং পারস্পরিক সংশোধন স্পৃহা। এই দাওয়াতি অভিযানে খালিদের আচরণের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অত্যন্ত দুঃখিত এবং বিমর্ষ হয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘ মোনাজাতে আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করেন এবং এক পর্যায়ে বলেন, "হে আমার মহান প্রভু ! খালিদ যা করে ফেলেছে তা তাৎক্ষনিকভাবে প্রতিহত করার ক্ষমতা আমার ছিল না, এ বিষয়ে আমি ছিলাম অপারগ।"

মুনাজাতের পর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন কেউ কি খালিদকে তাঁর আচরণের জন্য তাৎক্ষনিকভাবে ভৎসনা করেনি ? রাসূলুল্লাহ্কে বলা হল - খালিদের তীব্র সমালোচনা করেন সালিম এবং তাকে তিনি ভৎসনা করেন। এটা শুনে রাসূলুল্লাহর বিরক্তি এবং ক্রোধ কিছুটা প্রশমিত হয়েছিল।

ভন্ড নবীদের বিরুদ্ধে যিহাদ

রাসূলুল্লাহর ইন্তেকালের পর আরবে ইসলাম বিরোধী শক্তি প্রচন্ডভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর দায়িত্ব শুধু ধর্ম প্রচারে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি ছিলেন– সমাজ সংস্কারক ও রাষ্ট্র নায়ক। বহু জেহাদে তিনি স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অন্যান্য জেহাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল তারই হাতে। রাসূলুল্লাহ্র পূর্বে আরবদের নিজস্ব কোন রাজ্য বা সরকার ছিল না।

আরবের প্রতিভাধর উচ্চাকাংখী ব্যক্তিরা মনে করল ধর্ম প্রচারক হিসেবে সফলতা অর্জন করে, শেষ পর্যায়ে রাজ্য এবং রাজত্ব কায়েম করা যায়। রাষ্ট্রপতি হওয়া

www.nagorikpathagar.org

যায়। তাই তারা এ প্রক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে নবুওয়্যত দাবী করল। বিরাট বিরাট বাহিনীর অধিনায়ক হল।

এ ভন্ড নবীদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহর উত্তরাধিকারী খলিফা হযরত আবু বাকারকে অস্ত্র ধারণ করতে হয়। প্রথম পর্যায়ে ভন্ড নবীদের অনেক একযোগে মদীনা আক্রমণ করে বসে। তাদের এই অভিমৃশ্যকারিতা সুচিন্তিত এবং দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করা হয়। এর পরেও হযরত আবু বাকার (রাঃ)-কে ভন্ড নবীদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করতে হয়েছিল।

ভন্ড নবীদের প্রধান ছিলেন মুসাইলামা-তুল-কাজ্জাব। তার সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয় ইয়ামামা প্রান্তরে প্রচন্ডতম লড়াই। ইয়ামামার অভিযানে সাহাবী সালিম (রাঃ) এবং তাঁর নিরাপত্তাদাতা আবু হুজায়ফাও (রাঃ) অংশগ্রহণ করেছিলেন।

কুরআন বহনকারী সালিম

সালিম (রাঃ) এবং আবু হুজায়ফা (রাঃ) জেহাদের পূর্বেই পরস্পরকে আলিঙ্গন করে শপথ করেন যে, তারা পরকালের নাযাত এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য এই জেহাদে শাহাদাতকে লক্ষ্য রেখে আমৃত্যু যুদ্ধ করে যাবেন। আল্লাহ্ যেন তাদের এ মাকসুদ পুর করেন। এজন্য তারা যৌথ এবং আকুলভাবে মুনাজাত করেছিলেন।

যুদ্ধের শুরুতে হযরত আবু হুজায়ফা (রাঃ) মুসলিমদেরকে উদ্দেশ্য করে বুলন্দ কণ্ঠে বলেছিলেন – "ইয়া আহলুল কুরআন ! হে কুরআনের অনুসারীগণ ! তোমরা তোমাদের আমল দ্বারা কুরআনকে অলংকৃত কর।" তাঁর আশ্রিত ভ্রাতা এবং বন্ধু সালিম (রাঃ)-ও ঘোষণা করেছিলেন, "কুরআনের কত হতভাগ্য অনুসারী আমি হব, যদি আমি যে দিকে থাকি, সে দিকে আমার পূর্বে আমার অন্যান্য মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ আক্রান্ত হয়।" নিজেকে সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন, "হে সালিম ! তা হতে দিওনা। তার চেয়ে তুমি হয়ে যাও আল-কুরআনের সত্যিকার বহনকারী।

আবু হুজায়ফা (রাঃ) এবং সালিম (রাঃ) দু'জনেই শাহাদাতের লক্ষ্যে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় শত্রু দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাদের রক্তাক্ত তরবারী সূর্য কিরণে ঝল্ ঝল করে উঠে। প্রচন্ড বিক্রমে তারা বার বার শত্রু ব্যূহ ভেদ করতে থাকেন।

মুহাজির মুসলিমদের পতাকাবাহী ছিলেন যায়েদ ইবনে আল-খাত্তাব (রাঃ)। এক পর্যায়ে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। মুসলিম পতাকা তাঁর হস্তচ্যুত হয়। দ্রুত এগিয়ে আসেন সালিম (রাঃ) এবং দ্বীনের পতাকা উঁচু করে ধরে প্রচন্ড বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন।

www.nagorikpathagar.org

এক পর্যায়ে ডান হাতটি শত্রুর তরবারির আঘাতে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পতাকা হস্তচ্যুত হয়ে। কিন্তু তিনি যুদ্ধ ময়দান ত্যাগ করেন নি। বরং বাম হস্তে মুসলিম পতাকা উঁচু করে ধরে উচ্চ স্বরে মুসলিমদেরকে উৎসাহীত করার জন্য কুরআনের অমীয় বাণী তিলাওয়াত করা শুরু করেন।

তিনি পাঠ করেছিলেন সূরা আল-ইমরানের ১৪৬ নাম্বার আয়াত। যার অর্থ হল– "কত নবী যুদ্ধ করেছে, তাদের সঙ্গে ছিল "কত আল্লাহ্ওয়ালা। আল্লাহ্র পথে জেহাদকালে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তাতে তারা হীনবল হয়নি, দুর্বল হয়নি, নত হয়নি। আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদেরকে ভালবাসেন।"

যুদ্ধকালে আল্লাহ্র কালামের এই আয়াতটি ছিল মুজাহিদদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি আয়াত।

ভন্ড নবী মুসাইলামা-তুল-কাজ্জাব এর হত্যাকান্ড পর্যন্ত প্রচন্ড গতিতে এ যুদ্ধ চলেছিল। যুদ্ধকালে সালিম (রাঃ) মারাত্মক ভাবে আহত হন।

যুদ্ধের সমাপ্তিতে মুসলিমগণ শাহাদাত প্রাপ্ত মুজাহিদদের মৃতদেহ সন্ধান এবং একত্রিত করছিলেন। সে সময় তারা সাহাবী সালিমকেও খুঁজে বের করেন। তার প্রাণ বায়ু তখনও অবশিষ্ট ছিল।

শাহাদাতে বন্ধুত্ব

অনুসন্ধানকারীদের প্রতি মৃত্যু পথযাত্রী সালিমের প্রথম প্রশ্ন ছিল, আমার বন্ধু এবং ভ্রাতা আবু হুজায়ফা কী অবস্থায় আছে? বলা হল, তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন। সালিম (রাঃ) বললেন, আমার আর সময় নেই, আমাকে তার পাশে শুইয়ে দাও। তাকে বলা হল, তিনি আপনার অতি নিকটেই আছেন। একই স্থানে তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন।

সালিমের মুখে স্মিত হাসির রেখা ফুটে উঠল। পরম তৃপ্তিতে তিনি চোখ বন্ধ করলেন। তাঁর মুখ নিঃসৃত আর কোন বাক্য কেউ শুনতে পায়নি। তাঁর রূহ বন্ধু হুজায়ফার রূহের সাথে মিলনের জন্যই দেহ থেকে বের হয়ে চলে যায়।

সালিম এবং হুজায়ফার বিশ্বাস এবং আদর্শ ছিল এক এবং অভিন্ন। তাদের কর্ম-জীবন ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এবং পরে ছিল যৌথ। তারা একই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। একই স্থানে, একই পরিবেশে শাহাদাৎ বরণ করেন।

খলিফা উমরের মূল্যায়ন

আবু লুলু ফিরোজ কর্তৃক মারাত্মক আহত হওয়ার পর হযরত উমারকে বলা হয়েছিল, তাঁর উত্তরাধিকারী মনোয়নের জন্য। অন্তিম শয্যায় শায়িত হযরত উমর

www.nagorikpathagar.org

বলেছিলেন, হুজায়ফার মাওলা (আশ্রিত) সালিম (রাঃ) যদি জীবিত থাকত, আমি তাকেই আমার উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করতাম। আমি এ দায়িত্ব মজলিস-ই-শূরার উপর ন্যস্ত করতাম না। এখন এ দায়িত্ব আমি বহন করব না। (উসুদুল গাবা, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৪৬; ইসলামী বিশ্বকোষ ২৪ খন্ড, ২য় ভাগ পৃঃ ২৪৬)।

হযরত উমারের ন্যায় প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ মানব চরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্যালোচনাকারীর এই অভিমত মুসলিম সমাজে সালিমের অবস্থান সম্পর্কে পর্যাপ্ত আলোক সম্পাত করে।

www.nagorikpathagar.org

খাব্বাব ইবনে আল আরাত (রাঃ)

কিশোর খাব্বাব ইবনে আরাত (রাঃ) ছিল বনু তামীম গোত্রভুক্ত
ূর্ভাগ্যক্রমে অতি অল্প বয়সেই তাকে দাস হিসেবে ক্রয় বিক্রয়
ার্বশেষ দাস মালিকা ছিলেন মক্কার খুজাই গোত্রের এক বিধবা মা
ছল উম্মে আনমার।

মক্কার দাস বাজারে তিনি একটি দাস বালক ক্রয়ের জন্য গমণ
কাজ কর্মের জন্য তাঁর একটি চালাক-চতুর বালক ভৃত্য প্রয়োজ
তুর কিশোরকে দাস হিসেবে অন্যের কাজে ভাড়া দিয়ে কিছু অর্থ
ায়। যা বহু গৃহ ভৃত্যদের মাধ্যমে সম্ভব হত না।

াস ব্যবস্থা

আরব দেশে তৎকালে দাস ভাড়ার প্রথাও প্রচলিত ছিল। দাস
জ্জ্বল স্ব-প্রতিভ চালাক চতুর বালক উম্মে আনমারের দৃষ্টি আক
াস্থ্য ভাল, দেহ বলিষ্ট, চেহারায় বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

দাসটি বড় হলে বেশি দামে বিক্রয় করা যাবে এবং রেখে দিে
াসবে। তাই তিনি দামাদামী বেশি না করে সন্তুষ্টচিত্তে দাসটি নিয়ে
রলেন।

তৎকালে যোগাযোগ ও যানবাহনের সুবিধা ছিল সীমিত। একক
েলে দাস শিকারী দস্যু দলের হাতে পড়ার সম্ভাবনা ছিল।

বাণিজ্যিক কাফেলায় সুস্পষ্ট পরিচিতি ছাড়া লোক অন্তর্ভূক্ত হত না
ক্ষে ইচ্ছা করলেই পলায়ন করা ছিল অতি ঝুঁকিপূর্ণ। মূল মালি
ড়লে নির্যাতন তো ছিলই জীবন নাশের সম্ভাবনাও ছিল। তাই যা
ক্রয় হত তারা তাদের দুর্ভাগ্যকে ললাটের লিখন বলেই মেনে নিত

খাব্বাবের পিতার নাম আল-আরাত। তিনি ছিলেন নজদ এর
নি তামীম গোত্রভূক্ত।

একবার কয়েকটি মরুবাসী গোত্র একত্রিত হয়ে যৌথ বাহিনী গ
নু তামীম গোত্রীয় মরুদ্যানটি আক্রমণ করে বয়স্কদেরকে হত্যা ক
শু কিশোরদেরকে বন্দি করে। গবাদী পশু ও দ্রব্য সামগ্রী লুণ্ঠন

www.nagorikpathagar.org

পুরুষদের মধ্যে যারা দাস বাজারে বিক্রয় যোগ্য তাদেরকে বিক্রয় করে দেয়। মক্কায় ছিল আরবের বৃহত্তম দাস বাজার। বহু বাজার এবং ক্রয় বিক্রয়ের পর চড়া মূল্যের প্রত্যাশায় খাব্বার (রাঃ) মক্কার দাস বিপনন কেন্দ্রে আনীত হয়।

কর্মকারের প্রশিক্ষণ

নব ক্রয়কৃত দাস কিশোর খাব্বাবকে তাঁর মালিক বিধবা উম্মে আনমারের খুবই পছন্দ হয়েছিল। দাসটি শুধু প্রতিভাবান নয়। তাঁর মধ্যে সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, ইত্যাদি বহুবিধ গুণের সমাবেশে উম্মে আনমার ছিল অত্যন্ত মুগ্ধ। তিনি তাকে মক্কার একটি কর্মকারের কারখানায় লৌহজাত দ্রব্য নির্মাণ কাজ শিক্ষার জন্য ভর্তি করে দেন। এই কারখানায় তরবারীও তৈরী হত। খাব্বার (রাঃ) লৌহজাত ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি নির্মান কাজ শিখে অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজ তরবারী নির্মাণ কৌশলেও দক্ষ হয়ে উঠলেন। কামারের কাজে তাঁর অন্তর্নিহিত প্রতিভার বিকাশ ঘটতে লাগল।

উম্মে আনমার প্রথম প্রথম তাকে কামারের কারখানায় চাকরি করার সুযোগ দিলেন। বেতন যা খাব্বাব পেতেন, উম্মে আনমারই তা মালিক হিসেবে হস্তগত করতেন। তবে খাব্বাবকে পুত্রবৎ স্নেহে বড় করে তুলতে লাগলেন।

খাব্বাব (রাঃ) লোহার জিনিসপত্র তৈরিতে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জনের পর উম্মে আনমার নিজেই একটি কর্মকারের কারখানা স্থাপন করলেন। ব্যবস্থাপক ও বিশেষজ্ঞ হলেন খাব্বাব ইবনে আরাত (রাঃ)। স্বল্প সময়ের মধ্যে এ কারখানাটি মক্কার শ্রেষ্ঠতম তরবারী তৈরির কারখানায় উন্নীত হল। খাব্বার ইবনে আরাতের মাধ্যমে তাঁর মালিক আনমারের যথেষ্ট অর্থাগম হয়ে তিনি মক্কার একজন ধনাঢ্য মহিলা হিসেবে পরিগণিত হলেন।

চিন্তাশীলতা ও সামাজিক সমস্যা-চেতনা

প্রকৃতিগত ভাবে খাব্বাব (রাঃ) ছিল তীক্ষ্ণধী সম্পন্ন, বিচক্ষণ, ধীরস্থির বুদ্ধিদীপ্ত এবং কঠোর পরিশ্রমী। কর্মকারের কারখানায় সারা দিনের কর্ম শেষেও তার কিছু কাজ বাকী থাকত। তা হল নিজের ভবিষ্যত বিশেষ করে তাঁর চারি পাশের মানুষের ভবিষ্যত এবং তাদের কাজ কর্মের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা।

তৎকালীন আরব সমাজ ছিল বর্বর, অশালীন, শোষণমূলক ও পুঁতিগন্ধময়। তাঁর চারিদিকের মানুষের দুঃখ বেদনা ও দুর্দশা দেখে নিজের দাসত্ব ও স্বাধীনতার চিন্তা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। সর্বস্তরের বঞ্চনা ও সর্বহারা মানুষের কান্নায় তাঁর

www.nagorikpathagar.org

হৃদয় হাহাকার করে উঠত – অসহায় ভাবে তিনি ভাবতেন এর কী কোন শেষ হবে না। নিজ মনই বলে উঠতেন রজনীর অন্ধকার শেষে ভোরের সূর্য একদিন উদিত হবেই। তবে তা তাঁর জীবদ্দশায় হবে কিনা এটাই ছিল তাঁর একটি প্রশ্ন। জবাবের জন্য তাকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়নি।

খাব্বাবের দাসত্ব জীবনের কর্মস্থল মক্কাতেই শোষণ নির্যাতনের অমানিশা রজনীর শেষে ভোরের বা উষার প্রথম আলোর সূচনা হল।

নবুওতের উষা

কুরাইশ যুবক মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্‌র মুখ থেকে মানুষ নতুন কথা শুনতে পেল। মহান স্রষ্টা প্রতিপালক আল্লাহ ভিন্ন আনুগত্যের অধিকার আর কার নেই। একমাত্র তাঁর আদেশ নিষেধই সকলকে মানতে হবে। তিনি আহ্বান জানালেন সকল প্রকার বিশেষ অধিকার, অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ বঞ্চনার অবসানের। বিশেষ করে দাসদের প্রতি নির্যাতন ও বন্ধন শিথিল করে তাদেরকে মানবীয় মর্যাদা দানের। অভিজাত্যের অহংকার, বিত্তের অহমিকা, অপব্যয়, অপচয় রোধ করে মানুষের মনুষ্যত্বের স্বীকৃতির আকুল আবেদন তিনি জানালেন।

খাব্বাব ইবনে আল আরাত (রাঃ) এর কর্ণে রাসূলুল্লাহ্‌র বাণী অমৃত সুধার ন্যায় অনুভূত হল। ঘন তমশাচ্ছন্ন আরব সমাজে হঠাৎ করে যেন বিদ্যুৎ চমকাল।

মক্কায় নতুন নবীর আবির্ভাব হয়েছে। এ খবর তাঁর নিকট মধুময় অনুভূত হল। তিনি অধীর আগ্রহে রাসূলুল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গেলেন। তাঁর বাণী নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন। যে কথা শুনার জন্য তাঁর অশান্ত চিত্ত আকুল হয়ে উঠেছিল সে বাণী শুনে তিনি বায়াতের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং ঘোষণা করলেন আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রভূ নেই। মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা এবং রসূল। খাব্বাব ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম ১০ জনের মধ্যে একজন।

যদিও নও মুসলিমদের মধ্যে বিরাজ করত চরম ভীতি ও শংকা, খাব্বাবের মধ্যে তা দেখা গেল না। বরং তাকে মনে হয়েছিল আনন্দে উদ্বেল এবং উৎফুল্ল। কারণ যে সত্যের সন্ধানে তিনি ছিলেন তা নিজে এসে তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে।

ইসলাম গ্রহণের প্রতিক্রিয়া

খাব্বাব যে নতুন ধর্মের অনুগামী তা তিনি আনন্দের আতিশয্যে গোপন রাখতে পারলেন না। তার মালিকা উম্মে আনমার খবর পেয়ে বিষয়টি জেনে অত্যধিক ক্ষুব্দ হলেন।

www.nagorikpathagar.org

খাব্বাব (রাঃ) নতুন দিনের সন্ধান পেয়ে যত আনন্দিত হয়েছিলেন, উম্মে আনমারের ক্রোধ, বিদ্বেষ এবং ঘৃণা কোন ক্রমেই কম হয়েছিল বলে মনে হল না।

সে বিষয়টি তাঁর ভ্রাতা শীবা ইবনে আব্দুল উজ্জাকে জানাল। মালিককে না জানিয়ে একজন ক্রীতদাসের নতুন ধর্ম গ্রহণের বিষয়টি শুনে ভ্রাতা শীবাও হল ক্রোধান্ধ এবং অগ্নিশর্মা। চরম উত্তেজনায় তিনি খুজাহ গোত্রের যুবকদেরকে আহ্বান করলেন এবং তাদের দেবতা লাত ও উজ্জা বিরোধী ধর্ম মত খাব্বা (রাঃ) গ্রহণ করেছে এ বিষয়ে তাদেরকে অবহিত করলেন।

খুজা গোত্রের উত্তেজিত যুবকেরা তৎক্ষনাত খাব্বারের নিকট তাঁর কর্মস্থল লোহার কারখানায় গেল। খাব্বাব (রাঃ) ছিল তাঁর কর্মের মধ্যে গভীর ভাবে মগ্ন। শীবা ইবনে আব্দুল উজ্জা অগ্রসর হয়ে তাকে বললো। "আমরা শুনেছি তুমি আমাদের ধর্ম ত্যাগ করেছ এবং বনু হাশিমের গোত্রের এক ব্যক্তির প্রচারিত নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছ।" আমরা এটা বিশ্বাসই করতে পারি না"।

দ্বীনের আলোকে অভিভূত খাব্বাব (রাঃ) শান্ত সমাহিত ভাবে জবাব দিল, "আমি আমার ধর্মমত ত্যাগ করিনি। আমার ধর্মেই আমি আছি। আমার প্রভু একজন। তিনি আল্লাহ্ এবং তাঁর কোন শরীক নেই। আমি বিশ্বাস করি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আমার প্রভুর দাস এবং দূত।"

খাব্বাবের নির্ভীক প্রশান্ততায় শান্ত না হয়ে তারা হল আর অগ্নীশর্মা। কুকুর এবং শকুন যেভাবে মৃত পশুর উপর ঝাপিয়ে পড়ে সেভাবে শীবার নেতৃত্বে কুরাইশ যুবকেরা খাব্বাবকে আক্রমণ করলো। প্রথম ব্যবহার করল তাদের হস্ত ও পদ। তারপর নিল কামারের কারখানায় ব্যবহৃত লোহার পাত। কিছুক্ষণের মধ্যে খাব্বাব চেতনালুপ্ত হয়ে শয্যা গ্রহণ করল। তাঁর রক্তাক্ত দেহ হতে রূধিরধারা প্রবাহিত হতে লাগল।

হিজরত

সুযোগ বুঝে খাব্বাব (রাঃ) মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় আনসারদের উদার আতিথ্য এবং ভালোবাসায় খাব্বাব (রাঃ) বেঁচে থাকার আনন্দ অনুভব করতে থাকেন। এরূপ আরাম এবং শান্তি বিগত জীবনে খাব্বাব (রাঃ) পাননি। তাঁর আনন্দের ও শান্তির বড় কারণ ছিল রাসূলুল্লাহ্‌র সান্নিধ্য ও স্নেহ।

খাব্বাব ইবনে আল আরাত (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্‌র সঙ্গে বদর এবং উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। উহুদ যুদ্ধেই খাব্বাবের উপর নিপীড়নকারী শীবা ইবনে আব্দুল উযযা রাসূলুল্লাহ্‌র পিতৃব্য হামযার হস্তে মৃত্যু বরণ করেন। হযরত আলীর খিলাফত

www.nagorikpathagar.org

পর্যন্ত খাব্বাব (রাঃ) জীবিত ছিলেন। শিবা ইবনে আবদুল উজ্জা ছিল উম্মে আনমারের ভ্রাতা।

খলিফার দরবারে

একদিন খাব্বাব (রাঃ) খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎ মানসে হযরত উমারের নিকট গমন করেন। হযরত উমর (রাঃ) ছিলেন একটি সভায় ব্যস্ত। কেউ কোন মজলিশে গমণ করলে মজলিশবাসীরা বসে থাকেন, আগমন কারী উপবেশিতদেরকে সালাম দেন। কিন্তু হযরত উমার (রাঃ) খাব্বাবকে দেখেই দন্ডায়মান হন এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাকে সম্বর্ধনা জানান। হযরত উমার (রাঃ) উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে বলেন, হযরত বিলাল (রাঃ) ভিন্ন এই মজলিশে খাব্বাব (রাঃ) হতে মর্যাদাবান আর একজনও নেই। তিনি কুরাইশ মুশরিকদের হাতে কি ধরনের নির্যাতন ভোগ করতেন তার বর্ণনা দিতে খাব্বাবকে অনুরোধ করেন।

খাব্বাব (রাঃ) অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তাঁর উপরে নির্যাতনের করুণ কাহিনী বর্ণনা করেন। এক পর্যায়ে তিনি পিঠ খুলে হযরত উমারকে দেখান। পিঠে গর্ত দেখে হযরত উমর (রাঃ) শিহরিত হয়ে উঠেন।

জীবনের শেষ প্রান্তে খাব্বাব অত্যন্ত বিত্তশালী হয়ে উঠেন। তা ছিল তাঁর কল্পনার বাইরে। তবে দারিদ্রের প্রতিদানে তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। তিনি তাঁর দিরহাম এবং দীনার গৃহের এক কোন স্তুপাকার করে রাখতেন। এটা দরিদ্র ও নিরস্ত্রদের জানা থাকত।

হযরত খাব্বাব (রাঃ) দরিদ্রদেরকে দানে এত উদার ছিলেন যে, তাঁর অনুমতি ছাড়াই নিঃস্ব এবং দুঃস্থরা তাদের প্রয়োজনমত অর্থ খাব্বাবের গৃহকোণ থেকে তুলে নিতে পারতেন। এরূপ অকুণ্ঠ দানে সদা অভ্যস্থ থাকার পরও খাব্বাব (রাঃ) কিভাবে তাঁর নিকট জমাকৃত বিত্তের হিসাব দিবেন এ ভয়ে অস্থির থাকতেন।

খাব্বাবের অসুস্থকালে কয়েকজন সাহাবী তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গমন করেন। খাব্বাব (রাঃ) তাদেরকে বলেন এ গৃহে এখন রয়েছে প্রায় ৮০,০০০ দিরহাম। আল্লাহ্র কসম ! আমি অন্যায় ভাবে এ অর্থ সংগ্রহ করিনি। যাদের প্রয়োজন তা গ্রহণে কাউকে আমি বাঁধা দেইনি। কথা বলা কালেই খাব্বাব (রাঃ) ক্রন্দন করা শুরু করেন। তাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

হযরত খাব্বাব (রাঃ) তখন বলেন– আমি রোদন করি কারণ আমার সহযোগীগণ দুনিয়া ত্যাগ করে চলে গেছেন। তারা আমার মত পুরস্কার এ দুনিয়াতে পাননি। আমি দীর্ঘ হায়াত পেয়েছি। আমি দীর্ঘ হায়াত পেয়েছি। আর পেয়েছি

www.nagorikpathagar.org

প্রচুর অর্থ। আমি ভয় করি যা আমি এ দুনিয়াতে পেয়েছি শুধু তাই যদি আমার কাজের একমাত্র মজুরী হয়ে যায়। অতঃপর খাব্বাব ইবনে আল আরাত (রাঃ) ইন্তেকাল করেন।

খবর পেয়ে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) তাঁর কবর পাশে উপস্থিত হন এবং খাব্বাবের জন্য দোয়া করেন। তিনি বলেন–হে রাব্বুল আলামীন ! খাব্বাবের প্রতি তুমি দয়া পরবশ হও। সে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ইসলামকে কবুল করেছিল। সে স্বেচ্ছায় হিজরত করেছে। খাব্বাব যাপন করেছে মুজাহিদের জীবন। যে আল্লাহর রাস্তায় চলে ও নেক আমল করে আল্লাহ তাকে পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করেন না।

www.nagorikpathagar.org

নির্যাতীত খাব্বাব আল - আরাত (রাঃ)

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) এর অতি প্রিয় এবং স্নেহ - ধন্য মজলুম সাহাবী ছিলেন ক্রীতদাস খাব্বাব ইবনুল আরাত (রাঃ)। কুরাইশ সর্দার রাবিয়ার নেতৃত্বে আরব দস্যুগণ নজদের অন্তর্গত সাওয়াত এলাকা আক্রমণ করে বিভিন্ন কাবিলার নারী পুরুষ বন্দী করে এনে মক্কার দাস বাজারে বিক্রয় করে। এদের অন্তর্ভূক্ত ছিল হতভাগ্য খাব্বাব (রাঃ) এবং তার পিতা আরাত। পুত্র বিচ্ছিন্ন পিতা কোন পরিবারে হয়ত দাস হিসেবেই এ ধরাদাম ত্যাগ করেন। তৌহিদী আলোর পরশে খাব্বাব (রাঃ) নবজীবন লাভ করেন।

সাহাবী খাব্বাব ইবনুল আরাতের বংশ পরিচয় সম্পর্কে বিভিন্ন মুখী তথ্য সংকলিত হয়েছে। অধিকাংশ বর্ণনা মতে তিনি বিখ্যাত তামিম গোত্রের সাদ শাখা উদ্ভূত। তাঁর বংশ তালিকা সম্বলিত নাম হল – খাব্বাব, ইবনুল আরাত, (১) ইবনে জানদালাহ, ইবনে সা'দ, ইবনে হুযায়মা, ইবনে কাব, ইবনে সা'দ।

হযরত খাব্বাবের এক পুত্রের নাম ছিল আব্দুল্লাহ। খারিযীরা আব্দুল্লাহকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। আব্দুল্লাহর নাম অনুসারে তিনি আবু আব্দিল্লাহ নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁকে আবু ইয়াহিয়া, আবু মুহাম্মাদ এবং আবু আব্দির রাব্বিহী নামেও উল্লেখ করা হয়েছে।

খাব্বাব (রাঃ) মক্কায় দাস বাজারে উযযা আল হুযাই এর ক্রীতদাস অথবা তার ভগ্নি উম্মে আনমার এর ক্রীতদাস ছিলেন। হযরত আলীর বর্ণনা মতে, "নাবাতীয় বা নিওআরামাইকদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন। খাব্বাব (রাঃ) সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন।

সাধারণত তাঁকে প্রাথমিক ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের মধ্যে ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রথম ৭ জন ছিলেন যথাক্রমে (১) হযরত খাদীজা (রাঃ) (২) আবু বাকার (রাঃ) (৩) আলী (রাঃ) (৪) যায়েদ (রাঃ) (৫) আবুজর গিফারী (রাঃ) (৬) খাব্বাব (রাঃ) (৭) বিলাল (রাঃ) (৮) ইবনে সা'দ (ইবনে সাদঃ তাবাকাত)।

একক একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।" (ইসলামী বিশ্বকোষ, নবম খন্ড; পৃঃ- ৫৩২)।

ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে হযরত খাব্বাব (রাঃ) এত বেহাল হয়ে উঠেছিলেন যে, প্রকাশ্যেই তিনি তাওহীদের ঘোষণা দেন। এর পরিণতি সম্বন্ধে

www.nagorikpathagar.org

ছিলেন তিনি নিঃশঙ্ক এবং উদাসীন। তাওহীদি আনন্দের জন্য তাকে বহু খেসারত দিতে হয়েছিল।

তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে "তিনিই সর্ব প্রথম প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণাকারী হওয়ার ফলে কাফিরদের বর্বরোচিত নিপীড়নের শিকার হন। কাফিরগণ তাঁহাকে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর চীৎ করিয়া তাহার বুকের উপর উঠিয়া দাঁড়াইত। ফলে তাঁহার পিঠের গোস্ত পুড়িয়া যে রস নির্গত হইত তাহাতেই সেই অঙ্গার নির্বাপিত হইত। এই জন্য তাঁহার পিঠে বড় বড় দাগ অংকিত হইয়া গিয়াগিল।" (ইসলামী বিশ্বকোষ, নবম খন্ড, পৃঃ ৫৩২)।

হযরত খাব্বাব (রাঃ) আসহাব-ই সুফফার অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌র সঙ্গে তিনি বদর, উহুদ এবং অন্যান্য সকল যুদ্ধেই অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বদর যুদ্ধের পর তাকে মালে গণিমাত বা যুদ্ধলব্দ দ্রব্যাদি বন্টনের দায়িত্বও দেওয়া হয়। তিনি সিফফীন ও নাহরাওয়ান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত খাব্বাব (রাঃ) হতে ৩২টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

খাব্বাবের ইসলাম গ্রহণের প্রতিক্রিয়া

অভিজাত ও বিত্তশালী কুরাইশ মহিলা উম্মে আনমারের দাস খাব্বাবের মূর্তি বিরোধী ধর্মমত গ্রহণের খবরটি ঝড়ো হাওয়া ও বুনো অগ্নীর মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

বিষয়টি কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে ভাবিয়ে তুলল। তারা কল্পনা করতে পারেনি যে, একজন দাস অভিজাত কুরাইশ নেতৃবৃন্দের আরাধ্য দেবতার পূজা উপেক্ষা করবে এবং নির্ভয়ে তা ঘোষণা করবে।

ক্রীতদাস খাব্বাবের নির্ভীক উদ্ধত্য তাদেরকে ভাবিয়ে তুলল। সাহসেরও একটি সীমা থাকতে পারে। ক্রীতদাস খাব্বাবের সাহস সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

খাব্বাবকে রক্ষা করার মত কোন গোত্রীয় শক্তি তাঁর পিছনে ছিল না। যেমন ছিল বনু হাশেম এবং আবু বাকারের গোত্রের। নিজের পেশাগত কাজেই খাব্বাব (রাঃ) থাকতেন সদা নিরত। সাহাবী সালিমের ছিল আবি হুজায়ফার সঙ্গে পারস্পরিক আসাবিয়া বন্ধুত্ব সম্পর্ক। কোনরূপ বন্ধুত্বহীন এবং খাব্বাবের মত অসহায় দাস কিভাবে তার মালিকদের ধর্ম উপেক্ষা করতে পারে এবং নির্ভীক ভাবে ঘোষণা করতে পারে তা কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে ভাবিয়ে তুলল।

নতুন ধর্ম গ্রহণে খাব্বাবের দুঃসাহস যেমন পৌত্তলিক গোত্রাধিপতিদের ভাবিয়ে তুলেছিল, অনুরূপ ভাবে নওমুসলিমদেরকেও দিয়েছিল আত্মবিশ্বাস এবং অনুপ্রেরণা।

www.nagorikpathagar.org

তাঁরাও তাদের মূর্তি বিরোধী চিন্তাধারা ক্রমশঃ প্রকাশ করতে লাগলেন। মূর্তি পূজার যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলোচনা শুরু হল তাদের মধ্যে, যারা বিশ্বাসগত ভাবে মূর্তি-পূজা বিরোধী নয়।

নতুন ধর্মমত ও তার দুর্বল অনুসারীদের বিষয়টি নিয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করলেন। এতে আবুল হাকাম (আবু জাহল) ইবনে হিশাম, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব, ওয়ালিদ ইবনে আল মুগিরা, আব্দুল উজ্জা (আবু লাহাব) ইবনে মুত্তালিব প্রমূখও অংশ গ্রহণ করতেন।

নিরবে নিঃশব্দে রাসূলুল্লাহ্‌র ধর্মমত প্রসারিত হতে লাগল। কুরাইশ নেতৃবৃন্দও তাদের প্রতিক্রিয়া কর্ম ও পদ্ধতি স্থির করে নিল। কাবায় মূর্তি পূজারীদের নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, সকল গোত্রই সম্মিলিত ভাবে আরব সমাজে মূর্তি বিরোধী ধর্মের অনুসারীদের অনুসন্ধান করবে এবং চিহ্নিত করবে। তারপর উত্তোলন করবে অত্যাচারের খর্গহস্ত যে পর্যন্ত না নতুন মতের অনুসারীরা তাদের বিশ্বাস পরিবর্তন করে অথবা প্রাণ ত্যাগ করে।

খাব্বাবের উপর নিয়মিত নির্যাতন

খাব্বাবকে সোজা করার দায়িত্ব পড়ল তাঁর মালিকা উম্মে আনমারের ভ্রাতা সিবা ইবনে আবদ আল উজ্জার উপর।

প্রতিদিন তাকে নগরীর উন্মুক্ত অঙ্গনে পশুর মত বেঁধে নিয়ে যাওয়া হতো। মরু সূর্য উর্ধ্বাকাশে উঠার পর মক্কার বালুময় এবং প্রস্তরবৎ ভূমি হয়ে উঠতো অগ্নীর ন্যায় উত্তপ্ত।

পাথরের উপরে খাব্বাবকে রেখে দেয়া হত। দেহ থেকে জামা খুলে নেয়া হত। তার দেহে লোহার বর্ম উত্তপ্ত করে ছ্যাকা দেওয়া হত। তপ্ত লৌহের পাত দিয়ে ছাপ দেয়া হত। এতে তাঁর দেহ অসাড় এবং অবচেতন হয়ে পড়ত।

নির্যাতকেরা তখন জিজ্ঞাসা করতো এবার বল্‌ ! মুহাম্মাদ সম্বন্ধে তোর ধারণা কী? এত অত্যাচারের পরও মহামতি খাব্বাব (রাঃ) বলতেন "তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং দূত। সত্য প্রদর্শনের জন্যই তিনি ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন। গাঢ় অন্ধকার থেকে মানুষকে উজ্জল আলোয় নিয়ে যাবেন।" তাঁর এ সমস্ত কথার প্রতিক্রিয়া হত ভিন্নরূপ এবং ভয়ংকর। বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনে তাকে অজ্ঞান করে ফেলা হত।

কখন কখন লাত ও উজ্জা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হত। তিনি জবাব দিতেন, "লাত ও উজ্জা দু'টি মূর্তি মাত্র। মূক এবং বধির। কার কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা এগুলোর নেই। মহান খাব্বাবের মন্তব্য শুনে কাফের যুবকেরা

www.nagorikpathagar.org

অত্যাচারের মাত্রা আর বাড়িয়ে দিত। কখন কখন তাকে উত্তপ্ত পাথরের উপরে শোয়াতো। কখন নির্যাতকগণ উপুড় করে শোয়ায়ে তাঁর পিঠের উপর তপ্ত প্রস্তর খন্ড চাপিয়ে দিত।

খাব্বাবের ব্যথা বেদনা ছিল যন্ত্রণাদায়ক। অসহ্য ব্যথার কারণেও তিনি কখন হৃদয়ের সত্য প্রকাশে বিরত হতেন না।

শুধু যে সিবা ইবনে আল উজ্জাই হযরত খাব্বাবের উপর অসহনীয় নির্যাতন চালাতো তা নয়, মালিকার উম্মে আনমারে অত্যাচারও বিন্দুমাত্র কম ছিল না।

উম্মে আনমারের উপস্থিতিতে নির্যাতন

প্রতিনিয়ত অত্যাচারে জর্জরিত খাব্বাকে দেখার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একদিন তার কারখানায় আসেন। দূর্ভাগ্যক্রমে মালিকা আনমার তা দেখে ফেলে। এতে উম্মে আনমার ক্রোধে দিক-বিদিক হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

সে নির্যাতনকারী যুবকদেরকে আহ্বান করে এবং তাদের মাধ্যমে খাব্বাবকে শাস্তির ব্যবস্থা করলো। তারপর বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত সে খাব্বাবের কর্মশালায় গমন করত এবং নিজের উপস্থিতিতে খাব্বাবকে শাস্তি দেয়াত।

লৌহ কর্মশালায় জ্বলন্ত লোহার শলাকা খাব্বাবের মাথায় রাখা হত। তাতে তাঁর মাথার চামড়া পুড়ে যেত এবং তীব্র ব্যথায় খাব্বাব (রাঃ) সংজ্ঞা হারা হয়ে যেতেন।

কুরাইশগণ শুধু যে খাব্বাব, সুহাইব, বিলাল, আম্মারের ন্যায় দুর্বল, সর্বহারা, হতভাগ্য মুসলিমদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালাত তা নয়, এই হতভাগ্য মুসলিমদেরকে তীব্র ঘৃনাও করত।

একদিন কয়েকজন কুরাইশ গোত্রপতি একত্রিত হয়ে রাসূলুল্লাহ্‌র খোঁজে আসলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ্‌র সম্মুখে ছিলেন বিলাল, সুহাব, খাব্বাব, আম্মার এবং অন্যান্য দাস, দরিদ্র, দুর্বল, হতভাগ্য মুসলিম। তাদেরকে দেখে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ বিরক্তি ও ঘৃণা এবং ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তারা বললেন এ স্তরের লোকদেরকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে হে মুহাম্মদ ! তুমি সন্তুষ্ট চিত্ত ! তোমার

প্রভুত্ত তাদের প্রতি সন্তুষ্টই

তুমি কি করে আশা কর যে, তোমার এ বন্ধুবর্গদের আচরণ আমরা অনুসরণ করবো ? আল্লাহ কি তার অনুগ্রহ বর্ষণের জন্য এ হতভাগাদেরকে বেছে নিয়েছেন? এদেরকে বিতাড়িত কর। আমাদেরকে সঙ্গে নেয়ার উপযুক্ত হও। হতে পারে আমরা

www.nagorikpathagar.org

তোমাক অনুসরণ করব।

কুরাইশদের সঙ্গে রাসূলুল্লাহর উদ্ধৃত আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে আল-কুরআনের আয়াত নাযিল হয়। যাতে বলা হয়েছে ঃ-

"তুমি কুরআন দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করে দাও যারা ভয় করে যে, তাদেরকে প্রতিপালকের নিকট সমবেত করা হবে। তাদেরকে এমন অবস্থায় হাশরে সমবেত করা হবে যে, তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক (ওলী) বা সুপারিশকারী (সাফীউ) থাকবে না। হয়ত তারা সাবধান থাকবে (তারা যত হীনই হোক) তাদের প্রতিপালককে প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ডাকে, তাদেরকে তুমি বিতাড়িত কর না। যদি তুমি তাদের বিতাড়িত কর, তুমি জালেমদের অন্তর্ভূক্ত হবে। (আল-কুরআন; সুরা আনাম; ৬ঃ৫১-৫২)।

উম্মে আনমারের শীরপীড়া

খাব্বাবের উপর কুরাইশদের অকথ্য নিপীড়ন অব্যাহত ছিল। এ সময়ে খাব্বাবের একমাত্র আশ্রয় ছিল নির্যাতন, নিপীড়ন থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র নিকট মুনাজাত। তিনি উম্মে আনমার এবং তার নিপীড়নকারী ভ্রাতাকে হেদায়েত অথবা শাস্তির জন্য মুনাজাত করতেন। কিন্তু উম্মে আনমারের মন ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়েনি।

এ সময়ে খাব্বাবের মালিকা উম্মে আনমার তীব্র শীরপীড়া রোগে আক্রান্ত হন। কার কার ধারণা খাব্বাবের মাথায় জ্বলন্ত লৌহ শলাকা স্থাপণের প্রতিক্রিয়ায় উম্মে আনমার অসহনীয় শীর পীড়ায় আক্রান্ত হন।

উম্মে আনমারের সন্তানগণ মাতৃ চিকিৎসার জন্য বহু চেষ্টা করেন। তখন চিকিৎসকগণ তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে তার মাথায় সেকা দেওয়ার চিকিৎসার সুপারিশ করেন। এতে ধারণা করা হয় যে, খাব্বাবের উপর অত্যাচারের প্রতিক্রিয়াই তার এ রোগ হয়েছিল।

হযরত উমারের ইসলাম গ্রহণে খাব্বাবের প্রভাব

ইসলাম গ্রহণ করার পর খাব্বাব (রাঃ) দ্বীনের বিষয়ে অত্যধিক মনোযোগী হয়ে উঠেন। তিনি সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র ইবাদাতে দীর্ঘ সময় কাটাতেন। তদুপরি কুরআন শিক্ষায় ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ। কুরআন তিলাওয়াতেও তিনি উৎকর্ষতা অর্জন করেন।

হযরত উমার ইবনে খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণের বিখ্যাত ঘটনার সঙ্গে খাব্বাব ইবনে আল আরাত (রাঃ) জড়িত ছিলেন। ঘটনাস্থল ছিল হযরত উমারের ভগ্নী

www.nagorikpathagar.org

ফাতিমা বিনতে আল খাত্তাব (রাঃ) এবং তাঁর স্বামী সাঈদ ইবনে যায়েদের গৃহ। তারা উভয়েই ছিলেন নও মুসলিম। খাব্বাব ইবনে আল আরাত (রাঃ) তাদের বাসগৃহে গমন করতেন। তাদের নিকট কুরআন তিলাওয়াত করে শুনাতেন এবং তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতেন।

ঘটনার দিন হন্ত দন্ত হয়ে ক্রুদ্ধ উমার ভগ্নী গৃহে ঝড়ের মত আগমণ করেন। তখন ফাতিমা এবং তার স্বামী সাঈদ ইবনে যায়েদ খাব্বাবের উপস্থিতিতে কুরআন চর্চায় লিপ্ত ছিলেন। উমার খবর পেয়েছিলেন যে, তার ভগ্নী এবং ভগ্নীপতি ইসলাম গ্রহণ করেছে।

উমারের আগমনের ইঙ্গিত পেয়ে খাব্বাব (রাঃ) ঘরের কোণায় লুকালেন এবং ফাতিমা (রাঃ) কুরআনের পৃষ্ঠাগুলো লুকিয়ে ফেললেন। গৃহের বাহির থেকেই উমার (রাঃ) কুরআনের আবৃত্ত শুনেছিলেন। ক্রোধে অগ্নীশর্মা হয়ে তিনি ভগ্নীপতির উপর চড়াও হলেন। ভগ্নী বাঁধা দিতে এলেন। উমার (রাঃ) ভগ্নীকে নির্দয়ভাবে মারতে মারতে রক্তাক্ত করে ফেললেন।

ভগ্নীর মুখাবয়বে রুধির ধারা দর্শনে উমারের সম্বিত ফিরে আসল। হৃদয় কিছুটা নরম হল। ভগ্নীকে হয়ত সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি ভগ্নী যা পাঠ করছিলেন তা দেখতে চাইলেন। ভগ্নী আপত্তি করছিলেন এবং এক পর্যায়ে বলেন যে, ঐ পবিত্র লেখা স্পর্শ করার যোগ্য উমার নন। কারণ উমার ছিলেন কাফির এবং অপবিত্র। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ভগ্নী ফাতিমা উমারকে বললেন তুমি উযু ও গোসল করে পাক পবিত্র হয়ে আস। তারপরই কুরআন স্পর্শ করতে পারবে।

উমার ভগ্নীর নির্দেশ আংশিক পালন করলেন।

উমার ছিলেন সে কালে আরব বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অন্যতম। যে ১৮-১৯ জন লোক লেখাপড়া জানতেন উমার (রাঃ) ছিলেন তাদের একজন। পড়তে না জানলেও আরবগণ আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞান চর্চা করতেন।

কুরআনের বাণী পাঠ করেই উমার আল-কুরআনের মহত্ত্ব সঠিক ভাবে অনুধাবন করলেন। তাতে তাঁর মন ভরে গেল।

কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, খাব্বাব ইবনে আল আরাত ও গৃহ কোণে লুক্কায়িত অবস্থা হতে বের হয়ে এসে কুরআনের বাণী দেখাতে ফাতিমাকে অনুরোধ করেছিলেন এবং নিজে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনিয়েছেন।

কুরআনের আয়াত পাঠ করার পর ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে উমার (রাঃ) নিশ্চিত হলেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌র অবস্থিতি জানতে চাইলেন। উমারের মন ইসলামের

www.nagorikpathagar.org

দিকে আকর্ষিত হয়েছে অনুভব করে হযরত খাব্বাব (রাঃ) উমারকে সম্বোধন করে বললেন "হে উমার! আনন্দ কর। আমি মনে করি আল্লাহ ইসলামের জন্য তোমাকে কবুল করে নিয়েছেন। তা হয়েছে বিগত বৃহস্পতিবার রজনীতে তোমার জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মুনাজাতের কারণে। তিনি মুনাজাত করেছিলেন। "হে আমার প্রভূ! উমার ইবনে খাত্তাবকে দ্বারা ইসলামকে মজবুত কর।" খাব্বাবের কাছ থেকে উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (রাঃ) সে মুহূর্তে কোথায় আছেন জানতে চাইলেন।

খাব্বাব (রাঃ) জানালেন যে, রাসুলুল্লাহ মক্কার সাফা পর্বতের নিকট আরকাম ইবনে আল আরকামের গৃহে অবস্থান করছেন। উমার (রাঃ) সে গৃহে গমণ করে সেদিনই রাসূলুল্লাহ্‌র হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং কালীমা শাহাদাতের ঘোষণা দেন।

উমারের ইসলাম গ্রহণে নির্যাতিত মুসলিম শিবিরে আনন্দের ধারা প্রবাহিত হল। তবে উমারের ইসলাম গ্রহণ করার পরও নওমুসলিমদের উপর কুরাইশদের অমানবিক নির্যাতনের মাত্রা বিন্দু মাত্র সীমিত হয়নি।

www.nagorikpathagar.org

সাহাবী জুলাইবিব (রাঃ)

সাহাবী জুলাইবিব (রাঃ) এর বংশ পরিচয় কার জানা ছিল না। কে তাঁর পিতা অথবা কে তাঁর মাতা তাও জুলাইবিব জানতেন না। তাঁর পিতা-মাতাও হয়তো তাদের হতভাগ্য সন্তান জুলাইবিবকে কখন খুঁজে পাননি। কোন্ গোত্রে তাঁর জন্ম তাও জুলাইবিব অথবা তাঁর পরিচিত অথবা তাকে জানত এরূপ কার জানা ছিল না।

কুল -গোত্র, পিতৃ-মাতৃ পরিচয়হীন এ ব্যক্তির জীবন ছিল বড় দুঃখময়। যদিও মক্কা, মদীনায় বা আরব দেশে কোন রাজ পরিবারের ঐতিহ্য ছিল না, তবুও আভিজাত্যবোধ আরব কবিলা বা গোত্রগুলোর মধ্যে ছিল অত্যন্ত প্রখর। বংশ মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন আরব সমাজে জুলাইবিব (রাঃ) এর জীবন সুখময় হওয়ার কথা নয়।

আরবী ভাষা-ভাষী জুলাইবিব (রাঃ) যে ছিল একজন আরব সন্তান এটা ছিল স্বীকৃত। তিনি ছিলেন মদীনার একজন আনসার। হয়তো মদীনায়ই ছিল তাঁর আদি বাসস্থান। অথবা মদীনার নিকটস্থ কোন কবিলা হতে এই শিশু কার কোলে হাসতে হাসতে শহরে এসে হারিয়ে যায়।

কেউ কেউ হয়তো মনে করতো জুলাইবিব (রাঃ) ছিল এক কলংকিত শিশু। যার পরিচয় পিতামাতাও দিতে চাইত না। আবর্জনার মত বর্জ্য হিসেবে এ শিশু পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং পরবর্তী জীবনেও ঘৃণার বিষয় বস্তু হিসেবেই পরিগণিত হত।

আবু বারজা নামে আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি তাকে তো তার বাড়ীতেই প্রবেশ করতে দিত না। সে তার স্ত্রীকে বলেছিল "এই হতভাগাকে কখন আমার বংশ ও পরিবার ভুক্ত কারো ধারে কাছে ঘেষতে দিও না। যদি সে তোমাদের নিকটস্থ হয়, আমি এমন কিছু করব যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।"

শিশু জুলাইবিব (রাঃ) সাধারণত মেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলা করত এবং মেয়ে হিসেবেই পরিগণিত হত। কারণ পুরুষ শিশুরা পর্যন্ত তাকে হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপের লক্ষ্য বস্তু হিসেবে ধরে নিয়েছিল।

জুলাইবিব (রাঃ) এর মত ব্যক্তির কি কখনো মানুষের মর্যাদা নিয়ে সমাজে বসবাসের সম্ভাবনা ছিল? সে যে একজন ব্যক্তি এবং মানুষ হিসেবে স্বীকৃত এবং

www.nagorikpathagar.org

পরিগণিত হবে এরূপ সম্ভাবনা এবং আশা কি তাঁর ছিল? মানুষ হিসেবে অন্যান্য মানুষের যতটুকু স্বীকৃতি ও সম্পর্ক ততোটুকুও পাওয়ার প্রত্যাশা কি তাঁর ছিল ?

জুলাইবিব শব্দের অর্থ হল ক্ষুদ্র পোশাক। জিলবাব বা জালবাব শব্দের অর্থ হল- পোশাক। জুলাইবিব (রাঃ) ছিল বেঁটে। তাই তাকে তুচ্ছার্থে ক্ষুদ্র মানুষ না বলে ক্ষুদ্র পোশাক বলে আখ্যায়িত করা হত।

জুলাইবিবের অপর নাম ছিল যামিম। যার অর্থ হলো কুৎসিত, বিকলাঙ্গ এবং দেখতে ঘৃণার যোগ্য এক ব্যক্তি। সকল দিক থেকে সাহাবী জুলাইবিব (রাঃ) এর জীবন এবং সম্পর্ক ছিল অন্ধকার।

রাসূলুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে আল্লাহ্‌র রহমতে মদীনায় এক নতুন সমাজ সৃষ্টি হয়। এ সমাজের সব কিছু নওমুসলিমদের এক সঙ্গে মেনে নেয়াও ছিল অত্যন্ত কঠিন। অগতির গতি আশ্রয়হীনের আশ্রয়স্থল ছিল মদীনায় নব সৃষ্ট মুসলিম সমাজ। ইসলাম গ্রহণ করে জুলাইবিব (রাঃ) হয়ে গেল এ সমাজের একজন।

কুৎসিত হওয়ার কারণেই হয়ত জুলাইবিবের পিতামাতা চিরকালের জন্য তাকে পরিত্যাগ করেছিল। অথবা সে-ই হারিয়ে গিয়েছিল।

জুলাইবিব (রাঃ) এর মত কুৎসিত অপ্রিয় দর্শন ব্যক্তির জৈবিক প্রয়োজনের প্রতি, মানবতার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত মহানবী (সাঃ) অসচেতন ছিলেন না।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন এক আনসারের বাড়ীতে তাশরিফ আনলেন এবং গৃহ স্বামীকে বললেন। তোমার একটি মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা আমি করতে চাই।

আনসারী মুসলিম অনির্বাচনীয় সুখ ও পরমানন্দে উৎফুল্ল হয়ে উচ্চ স্বরে বলতে লাগলো "কত সৌভাগ্যবান আমি, হে আল্লাহ্‌র রাসুল। কত চমৎকার এ ঘটনা। আমার দৃষ্টিতে কত মধুর ও তৃপ্তিকর এ বিষয় যে, আমার কন্যার বিয়ে আপনার সঙ্গে হবে।" আনসার সাহাবী মনে করেছিলেন যে, রাসূল (সাঃ) নিজেই তাঁর কন্যাকে বিয়ে করতে চান।

বিব্রত হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন তোমার মেয়েকে আমি নিজে বিয়ে করতে চাই না। হতাশ মনে আনসার সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন তাহলে কার জন্য আমার মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব আপনি করছেন? রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) বললেন জুলাইবিবের জন্য।

প্রস্তাব শুনে আনসারীর তো আকাশ থেকে ভূমিতে পড়ার মত অবস্থা। কিন্তু প্রস্তাবকারীর মর্যাদার প্রতি সচেতন হয়ে আনসার সাহাবী ধৈর্য ধারণ করলেন এবং বললেন আমি কন্যার মায়ের সঙ্গে একটু আলোচনা করে দেখি। তাই বলে তিনি তার স্ত্রীর নিকট গেলেন।

www.nagorikpathagar.org

স্ত্রীকে সাহাবী বললেন "রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তোমার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। খবর শুনে সাহাবীর স্ত্রীরও আনন্দের সীমা পরিসীমা ছিল না। পরমানন্দে তিনিও চিৎকার করে উঠলেন। বললেন কত আশ্চর্যজনক এবং অবিশ্বাস্য এই প্রস্তাব। আমাদের জন্য কত তৃপ্তিকার এ ঘটনা। সাহাবী বললেন তিনি তোমার মেয়েকে নিজে বিয়ে করতে চাচ্ছেন না। তিনি তাকে বিয়ে দিতে চান জুলাইবিব এর সঙ্গে।

প্রস্তাব শুনে সাহাবীয়ার অবস্থাও সাহাবীর মতই। সেও চিৎকার করে বলল জুলাইবিবের সঙ্গে? না না তা কখনো হতে পারে না। আল্লাহ জীবন্ত। তাঁর শপথ করে বলছি – আমার মেয়ের বিয়ে এমন ব্যক্তির সাথে হতে পারে না। সাহাবীর স্ত্রী পাগলের মত বকতে বকতে আপন মনে কথা বলতে শুরু করলেন। আনসারী সাহাবী আর কী করবেন। তিনি রাসূলের নিকট ফিরে গিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানাতে রওয়ানা হলেন।

সাহাবীর কন্যা এর মধ্যে তাঁর মায়ের স্বগত উক্তিশুনে বিষয়টি বুঝে নিয়েছিলেন। সে এগিয়ে আসল এবং মাকে জিজ্ঞাসা করল আমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে তোমাদের কাছে কে এসেছেন?

তাঁর মা জুলাইবিবের সঙ্গে তাঁর বিয়ের প্রস্তাবের কথা জানালেন এবং প্রস্তাবকারী যে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) তাও তাকে বললেন। প্রস্তাবের বিবরণ শুনে আনসার সাহাবীর কন্যা থমকে গেলেন। প্রস্তাবকারী হিসেবে রাসূল (সাঃ) এর কথা শুনে সম্বিত ফিরে পেলেন। তাঁর মায়ের প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্য করলেন।

মা এর চরম হতাশা অবলোকন করে বললেন তোমরা কী রাসূলুল্লাহ্র সুপারিশ প্রত্যাখ্যন করতে চাও? আমাকে প্রস্তাবিত ব্যক্তির নিকটই পাঠাও। অবশ্যই সে আমার জন্য সর্বনাশের কারণ হবে না।

আল-কুরআনে বলা হয়েছে, যখনি আল্লাহ্ এবং রাসূল কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তের নির্দেশ দেন কোন মুমিন পুরুষ বা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকে না। কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে। "(সূরা আহজাব; ৩৩:৩৬)"।

বলা হয় যে আনসারীর মেয়েটি আল-কুরআনের এ আয়াতটি অবহিত ছিল এবং তাঁর পিতামাতাকে বলেছিল রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) আমার জন্য যা ভালো মনে করেন তাতে আমি সন্তুষ্ট এবং তাঁর ইচ্ছার প্রতি আমি নিজেকে সমর্পন করলাম।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর প্রতিক্রিয়া শুনে মুনাজাত করলেন "হে আমার প্রভু ! মেয়েটির প্রতি অগণিত কল্যাণ বর্ষণ কর। তার জীবনকে দুঃখ ও ক্লেশদায়ক কর না।"

www.nagorikpathagar.org

বলা হয় যে আনসারদের মধ্যে এ মেয়েটির থেকে উৎকৃষ্ট কোন বিবাহযোগ্য কন্যা ছিল না। এটা এক আশ্চর্য যে, এমন একটি মেয়ের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এমন একটি পাত্রের বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেন রাসূলুল্লাহ্‌র দোয়ার বরকতে তাদের দাম্পত্য জীবন ছিল অত্যন্ত সুখের।

সাহাবী জুলাইবিব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্‌র সঙ্গে এক অভিযানে গমণ করেন। এটা ছিল মুশরিকদের সঙ্গে একটি খন্ড যুদ্ধ। যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জানতে চাইলেন মুসলিমদের মধ্যে কারা আহত হয়েছে এবং কারা শাহাদাত বরণ করেছেন। সাহাবীরা প্রত্যেকেই তাদের আপন জন এবং পরিচিত জনের শাহাদাত এবং আহত হওয়া সম্পর্কে অবহিত করলেন।

এভাবে তিনি অন্যান্য সাহাবীদেরকেও একই প্রশ্ন করে তাদের খবর নিলেন। সাহাবীদের একটি গ্রুপ বলল তাদের কোন নিকট আত্মীয় এ জেহাদে শাহাদত বরণ করেননি। প্রতিক্রিয়ায় রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন আমি তো একজনকে হারিয়েছি সে হল জুলাইবিব। তোমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে তার অনুসন্ধান কর। তারা খোঁজ করতে লাগলেন এবং এক জায়গায় জুলাইবিব এর দেহ আবিস্কৃত হল।

তাঁর চারিদিকে ছিল সাত জন নিহত মুশরিক। হয়তো তিনি সাত জনকে হত্যা করে শাহাদত বরণ করেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) খবর শুনে দাঁড়ালেন এবং জুলাইবির (রাঃ) এর শাহাদতবরণ স্থানটিতে গমণ করেন। বেঁটে এবং বিকলাঙ্গ জুলাইবিব (রাঃ) এর দেহের পাশে তিনি দাঁড়ালেন এবং তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন "সে আমার এবং আমি তাঁর"। এ বাক্যটি তিনি কয়েকবার উচ্চারণ করলেন। তারপর তিনি জুলাইবিব (রাঃ) এর দেহের দিকে ঝুঁকে পড়লেন এবং তাকে নিজের হাতে তুলে নিলেন।

শাহাদাত প্রাপ্ত জুলাইবিব (রাঃ) এর সম্বন্ধে বলা হয় যে রাসূলুল্লাহ্‌র পবিত্র হস্তদ্বয় অপেদা জুলাইবিব (রাঃ) এর জন্য উৎকৃষ্ট কোন শয্যা হতে পারত না। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজে তাঁর কবর খোদাই করলেন এবং নিজেই জুলাইবিবকে কবরে রাখলেন।

www.nagorikpathagar.org

দু'জন রাবাহ

রাবাহ মাওলা রাসুলিল্লাহ

কৃষ্ণকায় গোলাম রাবাহ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর অশেষ স্নেহ ও আস্থাভাজন দাস ছিলেন। তিনি তাকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েও তিনি রাসূলুল্লাহকে ছেড়ে যাননি বরং সাহাবী মর্যাদায় ভূষিত হয়েছিলেন।

রাবাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহর মুয়াজ্জিন হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি দারুল ইয়ামানীয়ার নিকটে একটি বাড়ী করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে বাড়িটি মসজিদের নিকটে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করেন। কারণ অত দূরের বাড়ীতে হিংস্র জন্তুর আক্রমণের ভয় ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর একশত এর বেশি ভেড়া-ছাগল ছিল। রাবাহ ভেড়া ছাগল এর প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করতেন।

সাহাবী রাবাহর অন্য একটি বিশেষ দায়িত্ব ছিল তিনি সাক্ষাৎকারীদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে অনুমতি গ্রহণ করতেন। হযরত উমর (রাঃ) ও রাবাহ (রাঃ) এর মাধ্যমে সাক্ষাতের জন্য রাসূলুল্লাহর অনুমতি নিয়েছিলেন। সূত্রঃ (১) ইবনে হাজার আসকালানী ঃ আল ইসাবা) (২) ইবনুল আসীল ঃ উসদুল গাবা) (৩) ইবনে আব্দিল বার ঃ আল ইসতিয়াব)

রাবাহ মাওলা উম্মি সালামা (রাঃ)

উম্মুল মুমিনিন উম্মি সালামা (রাঃ) এর রাবাহ (রাঃ) নামে একজন গোলাম ছিল। উম্মি সালামা তাকে আজাদ করে দেন। তিনিও রাসূলুল্লাহ্র একজন সাহাবী ছিলেন।

উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেন "রাবাহ সালাত আদায়ে রত ছিলেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর পার্শ্ব দিয়ে গমণ করছিলেন। তখন রাবাহ সিজদায় থাকাকালে ফু দিয়ে ধূলা সরাইতে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ তাকে বলেন - "হে রাবাহ ! তুমি কি জান না ফুৎকার দেওয়াও তো কথারই অনুরূপ। বরং চেহারা ধুলা মনিল কর। (ইবনে হাজর আশকালানীঃ আল ইসাবা; ইবনুল আসীরঃ উসুদুল গাবা)।

www.nagorikpathagar.org

আমীর ইবনে ফুহায়রা (রাঃ)

আমীর ইবনে ফুহায়রা হযরত আবু বাকারের ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর জন্ম আয্‌দ গোত্রে। তাঁর মূল মালিক ছিলেন তোফায়েল ইবনে সানজারা।

হযরত আয়েশার (রাঃ) মাতা উম্মে রুম্মান এর প্রথম বিবাহ হয় উক্ত তোফায়েলের সঙ্গে। উম্মে রুম্মানের দ্বিতীয় স্বামী হলেন হযরত আবু বাকার (রাঃ)। আমীর ইবনে ফুহায়রার পূর্বতন দাস মালিক ছিলেন হযরত আয়েশার সৎ পিতা তোফায়েল।

ইসলামের শুরুতেই আমীর আল ফুহায়রা ইসলাম গ্রহণ করেন। এটা ছিল দারুল আরকাম গৃহে ইসলাম প্রচার কালের পূর্ববর্তী ঘটনা।

ইসলাম পূর্বকালে আরবে দাস-দাসীগণ কোন কোন ক্ষেত্রে জীব-জন্তুর যতটুকু অধিকার থাকে ততটুকুও ভোগ করতে পারত না। একজনের মালিকানাধীন পশুকে অপরজন মারপিট করলে এ নিয়ে পশু মালিক ও আক্রমণকারীদের মধ্যে ঝগড়া ফাসাদ সৃষ্টি হত। কিন্তু একজনের দাসকে আরেকজন স্বাধীন আরব কর্তৃক প্রহার করা নিয়ে দু'জন স্বাধীন আরবের মধ্যে ঝগড়া ফাসাদ সৃষ্টি হত।

এরূপ অমানবিক নীতির ফলে একজন নওমুসলিম দাস ইসলাম গ্রহণ করলে ইসলাম বিরোধীগণ মনের স্বাদে তাকে মারধর করতে পারতেন। নির্যাতনের জন্য তাকে অন্যত্র নিয়ে যেতে পারতেন।

আমীর ইবনে ফুহায়রা (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর ওপর তাঁর মালিকের বংশ এবং অন্যান্য ইসলাম বিরোধীদের নির্মম অত্যাচার শুরু হয়। তাঁর অসহায় অবস্থা দেখে হযরত আবু বাকার (রাঃ) তাকে ক্রয় করেন এবং আজাদ করে দেন।

হিজরতের সময় (৬২২ খ্রী) আমীর ফুহায়রা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং হযরত আবু বাকারের সঙ্গী হয়েছিলেন। হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (রাঃ) এবং হযরত আবু বাকার (রঃ) ছাওর গুহায় আত্মগোপন করেন। সন্ধ্যার পর আমীর ইবনে ফুহায়রা (রাঃ) আবু বাকারের বকরী এবং উষ্ট্রী নিয়ে ছাওর গুহায় উপস্থিত হতেন। তাদেরকে দুগ্ধ পান করাতেন এবং রাতের মধ্যেই লোকালয়ে ফিরে আসতেন।

মহানবী যখন সঙ্গীসহ ছাওর গুহা থেকে মদীনায় রওয়ানা হন আমীর ইবনে ফুহায়রা (রাঃ) এবং অমুসলিম আবদুল্লাহ ইবনে উবায়কিত তাদের সফর সঙ্গী হয়েছিলেন নুয়াযম ইবন বুশায়র হতে ক্রীত দু'টি উষ্ট্রী নিয়ে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)

www.nagorikpathagar.org

ব্যবহৃত উষ্ট্রীটির নাম ছিল কাসওয়া।

মদীনার আবহাওয়ায় মক্কার বহু সংখ্যক মুহাজির ধরে আক্রান্ত হন। আমীর ইবনে ফুহায়রা ছিলেন তাদের অন্যতম।

মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হারিছ ইবনে আউস আল আনসারীর সঙ্গে আমীর ইবনে ফুহায়রাকে ভ্রাতৃত্ব চুক্তিতে আবদ্ধ করেন।

আমীর ইবনে ফুহায়রা (রাঃ) বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি মাত্র ৪০ বছর বয়সে বীরে মাওনা এর ঘটনায় চর্তুথ হিজরীতে শাহাদাত বরণ করেন।

আবু বারা নামক এক নও মুসলিমের আবেদনক্রমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নজদে ইসলাম প্রচারের জন্য ৭০ জন সুশিক্ষিত ক্বারী হাফেজ সাহাবীকে প্রেরণ করেন। তারা তাদের জ্ঞানের জন্য কুররা নামে পরিচিত ছিলেন। ক্বারী শব্দের বহুবচন কুররা।

আমীর ইবনে ফুহায়রাও একজন ক্বারী এবং ইসলাম বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এই তাবলীগী দলটি মক্কা ও আশকানের মধ্যবর্তী বীর মাউনা নামক পৌছলে কাফেরগণ বিশ্বাস ঘাতকতা পূর্বক সকলকে হত্যা করে।

হযরত আমীর ফুহায়রাকে যখন বল্লম দ্বারা আঘাত করা হয় তিনি চিৎকার করে বলেন আল্লাহর শপথ, আমি কামিয়াব (শাহাদাৎ) লাভ করলাম।

আমীর ফুহায়রার লাশ খুঁজে পাওয়া যায় নি। ঘাতকদের বর্ণনায় জানা যায় তাঁর লাশ উর্ধ্বাকাশের দিকে উঠে গিয়েছিল। এই পবিত্র আত্মা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ফেরেস্তাগণ তাঁর লাশ ইল্লিনে নিয়ে গিয়েছেন।

সূত্রাবলী ঃ (১) সহীহ বুখারী, (২) ইবন হাজার আশকালানী ঃ ফাতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯০, (৩) বাদরুদ্দীন আইনী ঃ উমদাতুলক্বারী, ১৭ খণ্ড, পৃঃ ১৭৩-৭৪ (৫) ইবন আব্দুল বারঃ আল ইসতিয়াব, (৬) ইবনুল আসীর ঃ উসদুল গাবা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৯০-৯১।

www.nagorikpathagar.org

সালমান ফারসীর (রাঃ) প্রাথমিক জীবন

ধর্ম প্রবণতা

শিশুকাল হতেই সালমান ফারসী (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত সৎ এবং ধর্মপরায়ণ। সালমানের পিতার ধর্ম ছিল পারস্যের মেজিয়ান ধর্ম। এ ধর্মে অগ্নি দেবতার পূজা হত। তাদের মতে অগ্নি দেবতারই আছে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা। কারণ অগ্নি অল্প সময়ে সব পুড়ে ছারখার করে দিতে পারে। কেউ কেউ মনে করেন– সমুদ্র দেবতা বরুণ আরও শক্তিশালী। সমুদ্র বারি সকল অগ্নি নির্বাপিত করতে পারে।

ধর্মপরায়ণতার জন্য যে অগ্নি পূজারী ছিল সালমান পরিবার। পারিবারিক সে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখার দায়িত্ব কিশোর সালমানকে দেয়া হয়। সালমানের দায়িত্ব ছিল দিন ও রাত ২৪ ঘন্টার মধ্যে যেন কখনও এক মুহুর্তের জন্য হলেও পূজাকৃত অগ্নির লাল শিখা অস্তঃস্থ না হয়।

সালমানের পিতার ছিল অনেক জমি-জমা। তা হতে উৎপাদিত হত প্রচুর শস্য। সালমানের পিতা নিজেই জমি-জমা এবং শস্য উৎপাদনের দায়িত্বে ছিলেন।

সালমানের পিতা ছিলেন ইস্পাহান শহরের নিকটবর্তী 'যাইয়ান' গ্রামের একজন দিহক্বান অর্থাৎ সর্দার। তিনি ছিলেন গ্রামের সবচেয়ে ধনী এবং তার বাড়ীটাও ছিল সবচেয়ে বড়।

সালমান ফারসীর ইসলাম পূর্ব নাম হল মাবিহ ইবনে বূযিখশান। তাঁর বংশ লতিকা হল (১) মাবিহ (২) ইবনে বূযিখশান (৩) ইবনে মুরাষলান (৪) ইবনে বাহবূযান (৫) ইবনে ফিরূয (৬) ইবনে শাহরাখ।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে সালমান আল খায়র নামে সম্বোধন করেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর এ নামেই তিনি নিজেকে পরিচয় দিতেন। সালমান আল খায়র শব্দের অর্থ হল কল্যাণময়। ভালো শান্তি।

সালমানের পিতা বূযিখশানের জন্মস্থান ইস্পাহানের অন্তর্গত জায়্যো নামক নগরীতে। তাঁর মাতার জন্মস্থান ছিল যিশতান ও রামা হরমূর্য প্রদেশে। তাঁর মাতা ছিলেন অগাধ ভূ-সম্পত্তির মালিকা। তাই তাঁর পিতা শ্বশুরালয়ে আগমণ করেন। এখানেই জন্ম হয় সালমানের।

www.nagorikpathagar.org

পিতৃস্নেহ

সালমানকে তাঁর পিতা বূযিখশান অত্যধিক ভালোবাসতেন। তার অন্যান্য সন্তান অপেক্ষা সালমানকেই বেশি স্নেহ করতেন। সালমান (রাঃ) সম্বন্ধে পিতা ছিলেন অত্যন্ত আবেগ প্রবণ।

পিতার ভয় ছিল যে সালমানের কোনো বিপদ ঘটবে অথবা হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়বে। আকস্মিক রোগে সালমানের মৃত্যু হতে পারে। তার সব সময়ে আংশকা ছিল সালমান হয়ত তার হাত ছাড়া হয়ে যাবে। তাই তাঁর উপর কড়া নজর রাখতেন। শিশু কিশোর সালমানের প্রতি পিতার উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অনেকটা মনোরোগের ন্যায়।

হারাবার ভয়ে পিতা সালমানকে কোথাও একা যেতে দিতেন না। তাঁকে বাড়ীর মধ্যে বন্দী করে রেখেছিলেন বলা যেতে পারে। তাকে পিতা এমনভাবে রাখতেন যেমন মেয়েদেরকে অন্তঃপুরে রেখে লাল-পালন করা হয়। (উসদুল গাবা; ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২৮)।

গির্জায় প্রথম দিন

একদা সালমানের পিতা তাদের পল্লীর সর্দার হিসেবে দিহক্বান এর দায়িত্বে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। তাই তিনি সালমানকে পাঠালেন তার জমি-জমা এবং শস্য উৎপাদনের উপর অন্তত এক দিনের জন্য নজর রাখতে।

পিতার শস্য উৎপাদনের জায়গা জমিতে পৌছার পূর্বেই সালমানের গমণ পথের পার্শ্বে পড়ল একটি গীর্জা। গীর্জায় তখন আরাধনা চলছিল। গীর্জার মধ্যে উপাসনার কলতানের প্রতি আকৃষ্ট হল সালমান (রাঃ)। কিশোর সালমান (রাঃ) খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানত না। খ্রিষ্টানদের জীবন যাত্রা প্রণালী সম্বন্ধেও ছিল অনবহিত। কারণ সালমানকে পিতা হারিয়ে যাবার ভয়ে বাইরে যেতে বা কারও সাথে মিশতে দিতেন না।

খ্রীষ্টানদের সমবেত কণ্ঠের প্রার্থনা ধ্বনীর প্রতি সালমান (রাঃ) আকর্ষিত হলেন। সে তখন চুপি চুপি গীর্জার ভেতরে ঢুকে পড়ল। উদ্দেশ্য গীর্জাতে কী হচ্ছে তা দেখা। খ্রীষ্টানদের আরাধনা পদ্ধতি দেখে সালমান (রাঃ) অভিভূত হয়ে গেলেন এবং তাঁর মন খ্রীষ্ট ধর্মের দিকে আকর্ষিত হলও।

সালমান (রাঃ) মনে মনে বললেন– হে ঈশ্বর ! এ ধর্ম তো আমাদের ধর্ম হতে উত্তম। আমি সুর্যাস্তের পূর্বে এ গীর্জা পরিত্যাগ করব না। খ্রীস্ট ধর্ম সম্বন্ধে সালমান (রাঃ) গীর্জার প্রাদ্রী এবং অন্যদের সঙ্গে গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে আলোচনা করলেন।

www.nagorikpathagar.org

তিনি জানতে পারলেন যে, খ্রীষ্ট ধর্মের উৎপত্তিস্থল বৃহত্তর শ্যাম দেশে (সিরিয়া)।

খ্রীষ্টানদের সঙ্গে আলোচনায় তাঁর সারাটা দিন কেটে গেল। পিতার শস্য উৎপাদনশীল জমিতে আর যাওয়া হল না। সন্ধ্যার পর সালমান (রাঃ) গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

পিতা সালমানের কাছে এসে তাদের সম্পত্তির শষ্যের হাল হাকিকত জানতে চাইলেন। সালমান (রাঃ) তখন পিতাকে খ্রীষ্টানদের গীর্জার ধর্মীয় চিন্তা এবং পূজা সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং সে যে খ্রীষ্ট ধর্ম দেখে অভিভূত হয়েছেন তাও গোপন রাখলেন না। পিতা সালমানের হাল শুনে দুঃখিত এবং চিন্তিত হলেন।

পরে সালমানকে বললেন হে বৎস! খ্রীষ্ট ধর্মে হতে অনেক ভালো। তোমার ধর্ম এবং তোমার পূর্ব পুরুষের ধর্ম খ্রীষ্ট ধর্ম হতে অনেক ভালো। সালমান একমত হতে পারলেন না। সে প্রত্যয়ের সঙ্গে বললেন না তা হতে পারে না। তাদের ধর্ম আমাদের ধর্ম হতে উত্তম।

এতে পিতা হতভম্ব হয়ে গেলেন। ভাবলেন যে, সালমান পিতৃধর্ম পরিত্যাগ করবে। তাই পিতা তাকে বাড়ীতে তালা বন্ধ করে রাখলেন। এমনকি পায়ে লোহার চেইন দিয়েও আটকে রাখতেন।

খ্রীষ্টান কাফেলার সঙ্গে দেশ ত্যাগ

বিষয়টি সালমান (রাঃ) খ্রীষ্টান পাদ্রীদেরকে জানালেন এবং জানতে চাইলেন নিকট ভবিষ্যতে কোন কাফেলা সিরিয়া যাবে কি না?

কয়েকদিনের মধ্যে খ্রীষ্টানগণ তাঁর সঙ্গে যোগ সূত্র স্থাপন করল এবং জানাল যে, অদূর ভবিষ্যতে একটি কাফেলা ইস্পাহান থেকে সিরিয়া গমন করবে। কাফেলা প্রস্থানের নির্ধারিত তারিখে সালমান (রাঃ) নিজেকে লৌহ শৃংখল মুক্ত করে পিতার গৃহ হতে পালাল। বেশ কিছু অগ্রসর হয়ে কাফেলার সঙ্গে যোগ দিল। কাফেলা সিরিয়ার বড় নগরী দামেস্কে পৌঁছল।

দামেস্কে পৌছে সালমান (রাঃ) জানতে চাইল খ্রীষ্ট ধর্মের প্রধান ব্যক্তি কে? লোকজন গীর্জার বিশপের দিকে সালমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করাল। সালমান (রাঃ) বিশপের কাছে গিয়ে তাঁর কাহিনী বর্ণনা করল এবং জানাল যে, সে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করতে চায়। তদুপরি নবাগত বিধায় বিশপের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে চাই। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর থেকে খ্রীষ্ট ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করা এবং পাদ্রীর সঙ্গে প্রার্থনা করা। বিশপ সালমানকে তাঁর সেবায় গ্রহণ করতে রাজি হলেন।

www.nagorikpathagar.org

বিশপের অপকর্ম

সালমান (রাঃ) খ্রীষ্ট ধর্মের বিবিধ ধর্মীয় প্রক্রিয়ায় ওৎপ্রোত ভাবে জড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁর অদৃষ্টে ছিল হতাশা। কারণ গীর্জার বিশপ ছিলেন অত্যন্ত দূর্নীতিগ্রস্ত। তিনি গীর্জায় বক্তৃতা কালে খ্রীষ্ট ধর্মের অনুসারীদেরকে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অর্থ দানে উদ্বুদ্ধ করতেন। বিনিময়ে তাদেরকে স্বর্গের আশ্বাস দিতেন।

অনুসারীরা যখন ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অর্থ অনুদান করত তাঁর একটি বড় অংশ বিশপ লুকিয়ে ফেলতেন। দরিদ্র এবং অভাবীদেরকেও গুদামজাত সম্পদ হতে বঞ্চিত করতেন। এ পদ্ধতিতে বিশপ প্রচুর বিত্ত সম্পদের মালিক হয়ে বসেন।

বিশপ মারা যাওয়ার পর বহু খ্রীষ্টান তাকে সমাধিস্থ করতে এল। বিশপের কীর্তি কাহিনীর অনেক কিছুই সালমান (রাঃ) খ্রীষ্ট ধর্মের অনুসারীদেরকে অবহিত করলেন। সে যে অভাবী ও দরিদ্রদেরকে বঞ্চিত করে বিত্ত সম্পদ পুঞ্জিভূত করেছিল তারও কিছু কিছু কাহিনী তাদেরকে অবহিত করলেন। খ্রীষ্টানরা বিশপের সংগৃহীত সোনা-দানার উৎস আবিস্কারে উৎসাহিত হল।

সালমান (রাঃ) বিশপের পুঞ্জিভূত সোনা-দানার উৎসের সন্ধানও দিল। তারা সাতটি বড় কলসি বা মটকায় ভরা স্বর্ণ রৌপ্যের সন্ধান পেয়ে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হল।

বিশপের এ ধরনের চিত্রে গীর্জার পূজারী ও ধর্মের অনুসারীরা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো। তারা তাকে কবর দিতেও অনিচ্ছা প্রকাশ করল। তাকে ক্রুশ বিদ্ধ করে শূলীতে চড়িয়ে রেখে দিল এবং তার দিকে প্রতিদিন প্রস্তর নিক্ষেপ করতো।

সালমান (রাঃ) বিশপের উত্তরসূরীর খেদমতে নিয়োজিত হল। এ বিশপ ছিলেন স্বাত্তিক এবং ত্যাগী পুরুষ। অর্থের প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না। তাঁর মোহ ছিল পরকাল। তাই দিনরাত প্রার্থনা এবং বিবিধ আচার অনুষ্ঠানে নতুন বিশপ ব্যস্ত থেকে কালাতিপাত করতেন। বিশপের চারিত্রিক গুণাবলী ও মাধুর্যে সালমান (রাঃ) মোহিত হল এবং বিশপের সান্নিধ্যে এবং সেবায় সালমান (রাঃ) নিয়োজিত রইল বিশপের মহা প্রয়ান পর্যন্ত।

www.nagorikpathagar.org

সত্যের সন্ধানে সালমান ফারসি (রাঃ)

কিশোর সালমান ফারসী (রাঃ) সত্যের সন্ধানে সম্পদ ও মর্যাদা সম্পন্ন পিতৃ সংসার, মাতা-পিতার প্রিয় সান্নিধ্য ত্যাগ করে ইস্পাহান হয়ে সিরিয়ার দামেস্কে পৌছেন। যদিও বিফল হননি কিন্তু তাঁর মনজিলে মকসূদ ছিল বহু দূরে।

সিরিয়ার দামেস্কে দ্বিতীয় বিশপের সান্নিধ্যে তাঁর ধর্ম চর্চা এবং দ্বীন সাধনা ভালোই চলছিল। দ্বিতীয় বিশপের জীবন সায়াহ্নে সালমান (রাঃ) তাঁর কাছে পরবর্তী গুরুর সন্ধান কামনা করেন। বিশপের অন্তিম নির্দেশে সালমান (রাঃ) সিরিয়া থেকে ইরাকের মাওসিলে আরেকজন দ্বীনদার তৃতীয় পাদ্রী গুরুর সান্নিধ্যে আসেন।

মাওসীলের তৃতীয় পাদ্রীর অন্তিম অবস্থায় তাঁরই নির্দেশে নাসিবীন নামক শহরে আরেকজন দ্বীনদার পঞ্চম পাদ্রীর আশ্রয়ে আসেন। নাসিবীনের পাদ্রীর অন্তিম নির্দেশে সালমান (রাঃ) আম্মুরীয়ায় আসেন অন্য এক দ্বীনদার চতুর্থ পাদ্রীর সন্নিধানে। সালমান (রাঃ) খাঁটি দ্বীনের সন্ধানে তাঁর দীর্ঘকাল পরিভ্রমণের কাহিনী মৃত্যু পথযাত্রী আম্মুরিয়ার পাদ্রীর নিকট বর্ণনা করে তাঁর মৃত্যুর পর সত্যের সন্ধানে সালমান (রাঃ) কোথায় কোন দ্বীনদার ব্যক্তির নিকট যাবেন এই নির্দেশ আম্মুরিয়ার পাদ্রীর নিকট কামনা করেন।

আম্মুরীয়ার পাদ্রী সালমানকে হযরত ঈসার পর ইব্রাহীমী ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নতুন নবীর আগমণের সু-সংবাদ দেন। ঐ নবীর নিষ্ঠা, সততায়, নেককার লোকেরা হবে তাঁর প্রতি মোহিত এবং মুগ্ধ। পাদ্রী আরও বলেন যে, ঐ নবী দুই মরুভূমির মধ্যবর্তী খেজুর বৃক্ষ সুশোভিত দেশে হিজরত করবেন। তাঁর তিনটি আয়াত বা চিহ্নের উল্লেখ তিনি করেন। (১) পরবর্তী নবীর দুই কাঁধের মধ্যখানে নব্যুয়তের মোহর থাকবে। (২) তিনি সাদকা দ্রব্য খাবেন না তো তিনি (৩) হাদিয়া গ্রহণ করবেন।

আম্মুরীয়ার দ্বীনদার পাদ্রীর মৃত্যুর পর সালমান (রাঃ) পশুপালনে মনোযোগী হন। তিনি প্রচুর বকরী ও গাভীর মালিক হন। ঐ সময় আরবের ক্বালব গোত্রের একদল বণিক আম্মুরীয়া হয়ে স্বদেশ ভূমি আরবে প্রত্যাবর্তন করতেছিল। তাদের গন্তব্যস্থানের খবর পেয়ে সালমান (রাঃ) তাকে তাদের সঙ্গে নেয়ার প্রস্তাব দিলেন এবং তাঁর সকল বকরী গাভীগুলো এবং এমন কি তাঁর শেষ কপর্দক পর্যন্ত দানের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

www.nagorikpathagar.org

বণিকদল সন্তুষ্ট হয়ে সালমানের গাভী ও বকরীর পালসহ তাকে গ্রহণ করল। তাকে ভ্রমণ পথে খুবই আদর, যত্ন ও আপ্যায়ণ করল। কিন্তু ওয়াদি-উল কুরা নামক স্থানে এসে তারা স্বমূর্তীতে আবির্ভূত হল। তাঁরা প্রচুর অর্থের বিনিময়ে এক ইয়াহুদীর নিকট সালমানকে দাস হিসেবে বিক্রয় করে দিল। ওয়াদি-উল কুরা নামক স্থানটি ছিল মদীনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে।

আম্মুরীয়ার পাদ্রী সালমানকে নতুন নবীর হিজরতের স্থানের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন ওয়াদি-উল কুরায় সালমান সেরূপ স্থানের কিছু নমুনা পেলেন। দাস জীবন সত্ত্বেও সন্তোষবোধ করতে লাগলেন এ আশায় যে, তিনি হয়তো নতুন নবীর আবির্ভাব স্থানের নিকটে এসে পৌঁছেছেন।

সালমান (রাঃ) নিষ্ঠার সঙ্গে দাস হিসেবে এক নিষ্ঠুর ইয়াহুদীর সেবায় নিয়োজিত রইলেন বহুকাল। সর্বশেষে এই ইয়াহুদী সালমানকে ইয়াসরিবের বনু কোরাইজা গোত্রের আরেকজন ইয়াহুদীর নিকট বিক্রয় করে দিল। সালমানের নতুন মালিক ছিল পূর্বতন ইয়াহুদীর আত্মীয়।

নতুন মালিকের সঙ্গে সালমান (রাঃ) ইয়াসরিবে (মদীনায়) এসে পৌঁছলেন। মদীনার ভূ-প্রকৃতি দেখে সালমান (রাঃ) অত্যন্ত আনন্দিত ও অভিভূত হয়ে গেলেন।

এ মরুদ্যানটি ছিল বহু ধরনের খেজুর এবং পামতাল বৃক্ষ শোভিত। এরূপ একটি নগরীর বর্ণনাই আম্মুরীয়ার বিশপ সালমান (রাঃ) দিয়েছিলেন।

এ স্থান সম্বন্ধে সালমান (রাঃ) বলেন "আল্লাহ্‌র কসম ! মদীনার ভূ-প্রকৃতি দেখিয়া আমি ইহা চিনতে পারিলাম। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিল যে ইহাই সেই দেশ যাহার সম্পর্কে পাদ্রী আমাকে ধারণা দিয়াছিল"। (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৪-খন্ড-২য় ভাগ, পৃঃ ৯৯)।

ঐ সময়ে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) নবী হিসেবে মক্কায় আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। এ খবর যদি সালমান (রাঃ) জানতে পারতেন, তবে দাসত্বের বন্ধন মুক্ত করে হয়তো মক্কায় চলে যেতেন। কিন্তু দাসত্বের শৃঙ্খল এবং বোঝা এত মজবুত এবং ভয়াবহ ছিল যে, এ সম্পর্কে কোন কিছু অবহিত হওয়ার অবকাশ বা সুযোগ তাঁর ছিল না।

মদীনায় সালমান (রাঃ) তাঁর ইয়াহুদী মালিকের খেজুর বাগানে পরিচর্যায় লিপ্ত হলেন। এর মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসুল মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনার উপকণ্ঠে কুবায় তশরিফ এনেছেন।

www.nagorikpathagar.org

মহানবীর কুবায় আগমন

যেদিন মহানবী মুহাম্মাদ (দঃ) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনার নিকটে কুবা পল্লীতে আগমন করেন, সালমান (রাঃ) তখন ছিলেন তাঁর মালিকের তাল বৃক্ষ শীরে কর্মরত। ইয়াহুদী মালিকও ছিল বৃক্ষতলে কর্মব্যস্ত। তাঁর এক ভ্রাতৃষ্পুত্র দৌড়ে এসে বলল আউশ এবং খাজরাজ গোত্রের উপর ঈশ্বরের অভিশাপ বর্ষিত হোক। তাঁরা কুবা পল্লীতে জড়ো হয়েছে এমন এক ব্যক্তিকে আজ সম্বর্ধনা জানাতে, তিনি আগমন করেছেন মক্কা হতে। এ ব্যক্তি দাবী করেন যে, তিনি একজন নবী।

মালিকের ভ্রাতুষ্পুত্র কর্ত্রক আনীত এ বার্তা শ্রবণে সালমানের দেহে আবেগের তড়িৎ প্রবাহ শুরু হলো। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর দেহ এমন ভাবে কম্পিত এবং প্রকম্পিত হচ্ছিল যে তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন হয়তো তালবৃক্ষ তলে উপবিষ্ট মনিবের উপরেই তিনি পড়ে যাবেন। তার মনে হিচ্ছিল যে খেজুর বৃক্ষ তাকে নিয়ে ঘুরছে।

অতি কষ্টে তিনি আত্মরক্ষা করলেন এবং সতকর্তার সঙ্গে বৃক্ষ থেকে অবতরণ করলেন। মালিকের ভ্রাতুষ্পুত্র থেকে পুরো খবর জানতে চাইলেন। তাকে বললেন তুমি যেন কী একটি খবর দিলে। পুরো খবরটি আমাকে পুনরায় বিবৃত কর।

সালমানের উৎকণ্ঠায় তাঁর প্রভু অত্যধিক বিরক্ত হলেন। ক্রোধ সামলাতে না পেরে সালমানকে দিলেন অত্যন্ত শক্ত এক ঘুষি। নিষ্ঠুর ইয়াহুদী বলল এরূপ খবরে তোর কী প্রয়োজন। তুই যে কাজ করছিলি তাই করতে থাক।

সাদাকা ও উপঢৌকন

সালমান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন সেদিন বিকেল বেলা আমি কিছু খেজুর সংগ্রহ করে আল্লাহ্‌র নবী (সাঃ) কুবা পল্লীতে যেখানে অবস্থান করছিলেন তথায় গমন করি। আমি তাঁর নিকটস্থ হয়ে বললাম আমি শুনেছি আপনি একজন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি। আপনার সঙ্গীগণও এখানে অপরিচিত এবং অভাবী। আমি কিছু "সাদকা" আপনার জন্য নিয়ে এসেছি। অন্যদের থেকে এ সাদকায় আপনার প্রয়োজনই বেশি।

"সাদকা" শব্দটি শুনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হাত গুটিয়ে নিলেন এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে বললেন খেজুরগুলো খাওয়ার জন্য। সাদকা শব্দ শুনে রাসূলুল্লাহ্‌র প্রতিক্রিয়ায় সালমানের হৃদয়েও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। তিনি স্মরণ করলেন যে, পাদ্রী নতুন নবীর যে আলামত বলেছিলেন তাঁর একটি তো পাওয়া গেল।

এর পর রাসূলুল্লাহ্‌র কুবা থেকে মদীনায় আসলেন। সালমান (রাঃ) আরেক দিন আর কিছু খাবার নিয়ে রাসূলের কাছে গেলেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং বিনয়ে

www.nagorikpathagar.org

জানালেন যে, তিনি কিছু হাদীয়া এনেছেন যা সাদকা নয়। এবার রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জিনিসগুলো গ্রহণ করলেন। সকলকে খেতে দিলেন এবং নিজেও কিছুটা খেলেন। সালমান (রাঃ) ভাবলেন- নতুন নবীর নবুওয়্যতের অন্তত দু'টি আলামততো পাওয়া গেল।

কয়েকদিন পর সালমান (রাঃ) আবার মদীনায় রাসূলুল্লাহ্র নিকট গমন করলেন। তিনি একটি জানাযার সঙ্গে বাকিউল দারকাদে গমন করছিলেন। সুযোগ হলে এক সময় সালমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্র সম্মুখ হতে পিছনে আসলেন। আল্লাহ্র নবী তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তাঁর গাঁয়ের চাদর একটু সরিয়ে দিলেন। সালমান (রাঃ) মাহার-ই-নবুওয়্যত দেখে তাতে চুম্বন করলেন এবং কেঁদে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে সম্মুখে এনে বসালেন।

মহানবীর নির্মল সততা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যে সালমান (রাঃ) ছিলেন অতি মুগ্ধ এবং মোহিত। মহানবীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের সুযোগে সালমান (রাঃ) হয়েছিলেন মন্ত্রমুগ্ধ এবং শিহরিত। নিজের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে সালমান (রাঃ) মহানবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে একটি কবরস্থানে তিনি তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন।

সালমান (রাঃ) তখন সত্যের সন্ধানে তাঁর দীর্ঘ সফরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলেন এবং ঐ মজলিশেই ইসলাম গ্রহণ করলেন।

পবিত্র কালিমা পাঠ করে সালমান দ্বীন ইসলামের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলেন। তাঁর একটি নতুন পরিচয় তিনি লাভ করেন। কেউ তাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সালমান (রাঃ) বলতেন, "আমি সালমান (রাঃ)। আমি ইসলামের সন্তান। আদমের আওলাদের মধ্য হতে আমি একজন।"

(যাহাবী ঃ সিয়ারু আলামীন; ১ম খন্ড; পৃষ্ঠা ৫০৬-৫১০; ইবনে সাদ, তাবাকাত, চতুর্থ খন্ড, পৃঃ ৭৫-৭৯; উসদুল গাবা, ২য় খন্ড পৃ, ৩২৮-৩৩০)।

"তাওহীদের মূল শিক্ষা বাল্যকাল হইতেই সালমানের অন্তরে প্রোথিত হইয়া গিয়েছিল। ইহার প্রভাব ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই তিনি পরবর্তীতে দ্বীন-ই হানিফ (সত্য ধর্ম) এর অনুসন্ধানে শ্যামসহ বিভিন্ন দেশ সফর করেন এবং অবশেষে দাসরূপে মদীনায় পৌঁছেন। (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৪ খন্ড, ২য় ভাগ; পৃঃ ১০০)।

ইসলাম গ্রহণ

পরবর্তী চার বছর সালমান (রাঃ) ছিলেন কঠোর শ্রম ও তীব্র যাতনার শিকার। মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে সালমানের সম্পর্ক ছিল নাম মাত্র। যোগাযোগের সুযোগই ঘটতো না। বনু কোরাইজা গোত্রস্থ তাঁর মালিক উসমান

www.nagorikpathagar.org

ইবনে আসহাল আল কুরাজী সালমানকে এত কঠোর পরিশ্রমের দায়িত্ব দিতেন যে, তিনি মহানবীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বিন্দুমাত্র সময় করতে পারতেন না।

সালমানের উপরে দাস প্রভুর তীক্ষ্ণ নজর ও কাজের চাপ এত বেশি ছিল যে, তিনি বদর এবং উহুদ জেহাদে যোগদান করতে পারেননি। প্রাথমিক মুসলিমদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন না। এ জন্য ছিল তাঁর মানসিক বেদনা এবং যাতনা।

মুক্তিপণ

দাসত্ব থেকে মুক্তির নেশায় সালমান (রাঃ) ছিলেন পাগল। তিনি মুক্তি পণ দিয়ে মুক্তি ক্রয়ে ছিলেন অত্যন্ত উদগ্রীব। কিন্তু, তাঁর মালিক তাকে মুক্তি দিতে যে চড়া মূল্য হাঁকলেন তা সংগ্রহ ছিল সালমানের আয়ত্বের বাইরে। এর পরিমাণ ছিল ৪০ তোলা স্বর্ণ এবং ৩০০ তিনশত তাল খেজুর বৃক্ষ রোপন এবং সেগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা।

উপায়ন্তর না দেখে সালমান মহানবীর শরনাপন্ন হলেন। রাসূল (দঃ) তাকে সাহায্য করতে সম্মত হলেন।

রাসূল্লাহ (সাঃ) সাহাবীদেরকে আহ্বান করলেন এবং তাদেরকে তাল খেজুরের চারা দানে উৎসাহিত করলেন। একজন সাহাবী দিলেন ৩০টি। আরেকজন ২০টি। এমনিভাবে অনেকেই তাদের সাধ্যমত চারা এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি দিয়ে সাহায্য করলেন।

মহানবী (সাঃ) সালমানকে বললেন খেজুর, তালের চারা লাগাবার জন্য সঠিক আকার ও মানের ৩০০টি গর্ত করতে। তারপর তিনি নিজ হাতে ৩০০টি চারা রোপন করলেন। এরপর হল ৪০ তোলা স্বর্ণ সংগ্রহের প্রয়োজন। রাসূল (সাঃ) তাকে দিলেন এক পিন্ড স্বর্ণ। যা খনি থেকে সংগ্রহ করে তাঁকে উপহার হিসেবে দেয়া হয়েছিল। এ স্বর্ণ হতে ইয়াহুদীর কাঙ্খিত স্বর্ণ পুরো পরিশোধ করা হয়েছিল এবং শীঘ্রই সালমান হলেন ইয়াহুদীর দাসত্ব মুক্ত একজন স্বাধীন মানুষ।

খন্দক যুদ্ধের পূর্বাভাষ

নতুন প্রচারিত ধর্ম ইসলামের প্রসারে সালমান ফারসীর অবদান ছিল বহুমুখি। পঞ্চম হিজরীতে বিশ্বনবী (সাঃ) খবর পেলেন যে, বিরাট অশ্বারোহী দল সহ ১০,০০০ যোদ্ধার এক সৈন্য বাহিনী মক্কা থেকে বহির্গত হয়েছে। তাদের লক্ষ্য হল আল্লাহর জমিন থেকে মুসলিমদের নাম নিশানা একেবারে মুছে ফেলা।

www.nagorikpathagar.org

মক্কার কুরাইশ বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবে খায়বারের ইয়াহুদীগণ। বনু আসাদ এবং বনু গাতফান গোত্রীয় আরবগণও তাদের সঙ্গে মজবুত এক ঐক্যবদ্ধ সামরিক সংহতি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যেই তারা মদীনা আক্রমণ করে বসবে। এর মধ্যেই মুসলিমদের আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু ব্যবস্থা করার তা করতে হবে। এ খবরে মুসলিমগণ ভীত, শংকিত এবং বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) তাঁর অনুসারীদেরকে দৃঢ়, সংহত এবং ধৈর্য্যশীল হতে উদ্বুদ্ধ করলেন। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আলোচনার জন্য একাধিক শুরা মাহফিল অনুষ্ঠিত হল। এ দুর্যোগ মোকাবেলায় সকলেই তাদের চিন্তা, চেতনা নিবদ্ধ করেন। বহু ধরনের পরামর্শ, বুদ্ধি ও ধারণা সাহাবীদের থেকে আসতে লাগল।

পরিখা খনন

সর্বশেষে সালমান ফারসী (রাঃ) আসন ছেড়ে দন্ডায়মান হলেন এবং বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন হে আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ)। পারস্যে আমরা লক্ষ্য করেছি যখন শত্রু দলের শক্তিশালী অশ্বারোহী বাহিনী থাকে-আমরা নগরীর চারিদিকে পরিখা খনন করি। যা অতিক্রম করা এবং প্রয়োজন বোধে দ্রুত পিছে হেটে যাওয়া অশ্বারোহী বাহিনীর পক্ষে কষ্টকর হয়। এই ধারণাটি অনেকের কাছে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত, বাস্তবধর্মী এবং অভিনব মনে হল। পরিখা বা খন্দকের প্রশস্ততা ও গভীরতা কতটুকু হবে এ সম্পর্কে সালমানের পরামর্শ নেয়া হল।

নগরীর বিভিন্ন অংশ পরিখা খননের লক্ষ্যে সাহাবীদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হল। এটা ছিল একটা অতি বিরাট কাজ। এ কষ্টকর কাজে মহানবীসহ সকলেই অংশ গ্রহণ করতে হয়েছে। গর্ত খনন করতে হয়েছে। মাটি পাথর সরাতে হয়েছে। যুদ্ধ সঙ্গীত গেয়ে কর্মীদের মনোবল এবং উৎসাহ উন্নতমানের সংরক্ষণ করতে হয়েছে।

সালমান ফারসী (রাঃ) শক্তি সাধনায়, শ্রমে এত নিবেদিত প্রাণ ছিলেন যে, বলা হত তিনি একাই ১০ জনের কাজ করতে পারেন। মদীনা নগরীর চারিদিকে পরিখা খননের দায়িত্ব প্রাপ্ত সাহাবীদের প্রত্যেক দল সালমান ফারসীকে তাদের একজন দাবী করে তাঁর উপস্থিতি প্রত্যাশা করতেন।

খন্দক যুদ্ধের সময়ে মুহাজীর এবং আনসারদের মধ্যে সালমানকে পাওয়ার জন্য রীতিমতো প্রতিযোগীতা হতো। মুহাজীরগণ বলতেন সালমান আমাদের লোক। আনসারগণ বলতেন -সালমান আমাদের দলভুক্ত। (সিয়ারুস সাহাবা, ২য় খন্ড, পৃঃ ৯৬)।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন মুগ্ধ চিত্তে বলতেন "সালমান আমাদের মধ্যে একজন। সালমান আমার আহল বা পরিজনের অন্তর্ভূক্ত।"

৬ দিনের মধ্যে মদীনার ৪ দিকে সুদীর্ঘ পরিখা খনন করা হয়েছিল। এ সময় সাহাবীদের বিশ্রাম ছিল না বললেই চলে।

কুরাইশ এবং তাদের মিত্রদের সৈন্য বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হল। মুসলিমদেরকে পরিখার অপর দিকে দেখে তারা খুবই আনন্দিত হলো। ভাবল, অতি দ্রুত তীব্র আক্রমণের মাধ্যমে মুসলিমদেরকে নিশ্চিহ্ন করা যাবে।

পরিখা অতিক্রম অসম্ভব

কুরাইশ বাহিনী মদীনার নিকটবর্তী হল এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর মাঝখানে চওড়া এবং গভীর পরিখা দেখে আশ্চর্য হল। আবু সুফিয়ান মুসলিম বাহিনীর নিকটবর্তী হয়ে বললেন এ ধরনের রণকৌশল আরব দেশে ইতিপূর্বে কখনও অবলম্বিত হয়নি।

অবরোধ পরবর্তী বহুদিন পর্যন্ত কুরাইশগণ পরিখা অতিক্রম করে মুসলিমদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভঙ্গ করতে বহু চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল।

দীর্ঘকাল পর্যন্ত কুরাইশ ও মিত্র বাহিনী অবরোধ চালিয়ে রাখলেন। মুসলিমদের ধৈর্য্য, শ্রমশীলতা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার বহু পরীক্ষা হল। কিছুতেই কুরাইশ বাহিনী মদীনায় প্রবেশ করতে পারেনি। সর্বশেষ কুরাইশ বাহিনী ও মিত্র বাহিনী উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়ে ছত্র ভঙ্গ হয়ে যেতে লাগল।

কুরাইশগণ এসেছিল দুনিয়ার বুক থেকে মুসলিমদের চির কালের জন্য অপসারিত করতে। কিন্তু আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল রেখে মুসলিমদের ঐক্য, দৃঢ়তা ও পরিখা কৌশলের নিকট কুরাইশদের সকল কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল।

জালুলা বিজয়েও সালমান (রাঃ) অংশ গ্রহণ করেন।

সালমান ফারসীর বহুবিধ অবদান

এরপর বহু বছর পর্যন্ত সালমান ফারসী (রাঃ) রাসূলুল্লাহর সান্নিধ্যে ছিলেন। ঘটনাক্রমে দীর্ঘ সময়ে সালমান ফারসীর বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা, নেয়ামত মুসলিমদের ভাগ্যে ঘটে। সালমান (রাঃ) থেকে মুসলিমগণ যতটুকু নির্ভরযোগ্য পরামর্শ, যুদ্ধ কৌশল এবং যথাযথ সাহায্য পেয়েছিল এরূপ আর কোন অনারব সাহাবী থেকে পাওয়া গেছে কি না সন্দেহ। প্রত্যেক অভিযানে সালমান ফারসীর বুদ্ধিমত্তা ও নতুনত্বের আমেজ ছিল।

www.nagorikpathagar.org

পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ পালন

সালমানের নেতৃত্বে আল্লাহর নবীর নির্দেশ পালনে সালমান (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং অনুগত। পূর্ণাঙ্গ কোন নির্দেশ আংশিক পালনে তার ছিল প্রকৃতিগত তীব্র অনীহা। একবার মুসলিমদের একটি দল ফারস্যের বিরাট এক দুর্গ অবরোধ করেন। জেহাদে উৎসাহিত মুজাহিদগণ ছিলেন শাহাদতের ও শহীদের নেশায় পাগল। কালক্ষেপণ না করে আক্রমণের ইচ্ছায় ছিলেন উদগ্রীব।

তাদেরকে নিরস্ত্র করে সালমান ফারসী (রাঃ) বললেন- আমি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করব। আমার প্রিয় নবী পথহারাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান করতে বলেছেন।

অবরুদ্ধ দুর্গবাসীদের প্রতিনিধি ও লোকদেরকে সম্বোধন করে সালমান ফারসী (রাঃ) বলেছিলেন - আমি একজন ফারসী। আমি তো তোমাদেরই লোক। তোমরা কি দেখছ না আরবগণ আমার হুকুম পালন করছে? তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ কর, আমাদের যা আছে তা থাকবে তোমাদের। আমরা যা অথবা যে কিছুর বিরুদ্ধে তোমরাও হবে তাদের বিরুদ্ধে।

তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করতে না চাও, তোমরা মুসলিমদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত হতে পার। তবে সামরিক দায়িত্ব অব্যাহতি মুলক জিযিয়া কর তোমাদেরকে আদায় করতে হবে। ফারসীয়ানদেরকে প্রদত্ত দুটি প্রস্তাবের একটিও তারা গ্রহণ করল না। বরং তারা বলল - তোমাদের সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করব।

এতে মুসলিম মুজাহিদগণ দুর্গবাসীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে জিহাদ করার দাবী জানাল। কিন্তু সালমান ফারসী (রাঃ) বারণ করলেন। তিন দিন পর্যন্ত তিনি দুর্গবাসী এবং তাদের প্রতিনিধিবর্গকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের আহ্বান জানালেন। সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে মুজাহিদদেরকে দুর্গ আক্রমণের নির্দেশ দিলেন।

তাঁর নির্দেশ এবং নেতৃত্ব এমন সুনিপুণ ছিল যে, অতি সহজে দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ল। পাকা ফল যেমন বৃক্ষ থেকে ঝরে পড়ে তেমনভাবে দুর্গটি বিজিত হল। সালমানের বিচক্ষণ প্রজ্ঞা, সঠিক ও যথাযথ সিদ্ধান্ত, আচরণে বহু সুন্দর দৃষ্টান্তে তাঁর জীবন কাহিনী ভরপুর।

www.nagorikpathagar.org

সালমান ফারসীর (রাঃ) চরিত্র

সালমান ফারসীর চরিত্র

মহামতি সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) এর বহু প্রশংসা সূচক উপনাম ছিল। তাঁর একটি ছিল ছালেহ আমাল (উত্তম কর্মী)। সালমান ছিলেন একজন মহা জ্ঞানী। কিন্তু তাঁর জীবন ছিল অত্যন্ত কঠিন। সংসার বিমুখ, সরল এবং ত্যাগী, ভোগ লিপ্সাহীন।

সালমানের একটি চাদর ছিল। এই চাদরে করে তিনি লাকড়ী সংগ্রহ করতেন। অর্ধ্বাংশ ব্যবহার করতেন ঘুমাবার জন্য এবং অর্ধ্বাংশ গায়ে দিতেন। (তাবাকাত ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৮৭)। তাঁর ছিল মাত্র একটি জুব্বা। কখনও এটি গায়ে দিয়ে তিনি ঘুমাতেন। বেশ ভূষা এবং এক চাদরে সালমানকে একজন ফকির বা শ্রমিকের বেশি মনে হত না।

গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁর গবাদী পশুর জন্য খাদ্য ক্রয় করেন। সালমানকে দেখে লোকটি তাকে একজন ভাড়ায় খাটা শ্রমিক মনে করেন। এবং তাঁর পশুর খাবার বাড়ীতে পৌছিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে সালমান ফারসী বোঝাটি মাথায় তুলে ক্রেতার সঙ্গে চললেন।

তখন সালমান (রাঃ) ছিলেন মাদাইনের (পারস্যের) গভর্ণর। রাস্তায় পথচারী সালমানের মাথায় বোঝা দেখে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক নিজেদের মাথায় নেয়ার জন্য টানাটানি করতে থাকেন। কুলির এত সম্মান দেখে লোকটি একজনকে জিজ্ঞাসা করল। এ শ্রমিক কে? লোকজন উত্তর দিল তিনি তো রাসূলুল্লাহ্‌র প্রিয় সাহাবী সালমান ফারসী (রাঃ)।

পশু খাদ্য ক্রেতা লজ্জিত হয়ে সালমানকে বলল আমি তো আপনাকে চিনতে পারিনি। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। এই বলে পশুর খাদ্যের বোঝা টানতে লাগল। কিন্তু সালমান (রাঃ) তা হস্তান্তর করলেন না। বললেন আপনার বোঝা বহন করা উদ্দেশ্য হল আমার সাওয়াব লাভ করা। তাই আপনার বাড়ি পর্যন্ত না পৌছিয়ে আমি এ বোঝা নামাব না। (তাবকাত চতুর্থ খন্ড,পৃঃ ৮৮ঃ সিয়ারুস সাহাবা, ২য় খন্ড, ৯১ পৃঃ)।

www.nagorikpathagar.org

বাসগৃহ

বসবাসের জন্য সালমান ফারসী (রাঃ) কোন ঘর বাড়ী নির্মাণ করেন নি। আল্লাহ্‌র আকাশের নীচে, বৃক্ষ তলে ও দেয়ালের ছায়ায় তিনি ঘুমাতেন।

কখনও কখনও তিনি কারো দেয়ালে হেলান দিয়ে বসতেন এবং দেয়ালের পাশে শুয়ে পড়তেন। তাঁর সংসার বিমুখ গৃহহীন জীবন যাত্রা লক্ষ্য করে একজন সাহাবী তাকে বললেন-থাকার জন্য একটি ক্ষুদ্র কুঠির কি আমি তোমার জন্য তৈরী করে দিতে পারি না ? সালমান (রাঃ) বললেন জীবন তো ভালই চলছে। গৃহের প্রয়োজন অনুভব করি না।

উক্ত সাহাবী বললেন যে ধরণের গৃহ তোমার জন্য যথাযথ সে ধারণা এবং জ্ঞান আমার আছে। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বললেন - বর্ণনা করে শুনাও। উক্ত ব্যক্তি বললেন - আমি তোমার জন্য তৈরী করে দিব এমন একটি কুঠুরি যখন তুমি দাঁড়াতে চেষ্টা করবে, মাথায় তুমি আঘাত পাবে। লম্বা হয়ে শোয়ার জন্য পাগুলো যদি তুমি প্রসারিত কর, দেওয়াল তোমার পাগুলোকে উচিত শিক্ষা দেবে।

ঐ ব্যক্তি তার নিজস্ব বর্ণনা অনুযায়ী সালমানের জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করে দেন। (আল ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড, ৬৩৬ -৩৬)।

সরল জীবন যাত্রা

দুনিয়ায় কোন বস্তুর প্রতি সালমানের আকর্ষণ ছিল না। বালিশ রূপে সালমান ২ খানি ইট ব্যবহার করতেন। এর পরেও সালমান (রাঃ) রোদন করতেন এই বলে রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন-মানুষের ছামান -পত্র একজন মুসাফিরের ছামানের অধিক যেন না হয়। আর আমার এ অবস্থা। (মুসনাদ আহমাদ ইবনে হাম্বল; পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৪৩৮-৩৯)।

মৃত্যুকালনি অসুস্থতার সময়ে সা'দ ইবনে আবি ওযাক্কাস সালমান (রাঃ) ফারসীকে দেখতে যান। সা'দকে (রাঃ) দেখে সালমান রোদন (রাঃ) শুরু করলেন সা'দ তাকে সান্তনা দিয়ে বলেন "হে আবু আব্দুল্লাহ ! তোমার ক্রন্দনের কি আছে? আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) তোমার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর হাত থেকে তুমি হাউজ-ই কাউসার অমৃত পান করবে। জান্নাতে সঙ্গী- সাথীদের সঙ্গে শীঘ্রই তোমার সাক্ষাৎ হবে।

সালমান (রাঃ) বলেন আল্লাহ্‌র কসম। আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। দুনিয়ার কোন মোহ আমার মধ্যে নেই। আমি ক্রন্ধন করছি এ জন্য যে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমার নিকট থেকে একটি অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। আমার আসবাব পত্র যে একজন

www.nagorikpathagar.org

মুসাফিরের সামান হতে বেশি না হয়। অথচ আমার চারি দিকে কত স্বর্ণ রয়েছে। এ বলে তিনি তার আসবাবপত্রের দিকে ইঙ্গিত করলেন। হযরত সা'দ বলেন, "যে আসবাব পত্রকে সালমান স্বর্ণ বলে ঈঙ্গিত করেছেন তা ছিল একটি বড় পিয়ালা। একটি চিলমছি, এক খানা থালা। এর ভয়ে সালমানের মত লোক ক্রন্ধন করছিলেন। মৃত্যুর পর সালমানের সকল মাল সামানের মূল্য দাঁড়ায় ২০ দিরহাম।

সালমান ফারসী (রাঃ) ৩৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৭৬ বা ৭৭ বছর।

শ্রমলব্ধ আয়ে জীবনযাপন

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হযরত হুজায়ফা ইবনে ইয়ামানের পর খলিফা উমার (রাঃ) এর আমলে নিযুক্ত হন মাদাইনের গভর্ণর বা আমীর। তাঁর বেতন ছিল বার্ষিক ৫(পাঁচ) হাজার দিরহাম। সম্পূর্ণটাই তিনি সাদাকা হিসেবে বিতরণ করে দিতেন। নিজের হাতে কাজ করে তিনি যা অর্জন করতেন - তা দিয়ে তাঁর জীবন চলে যেত।

আরব থেকে একটি জামায়াত মাদাইনে এসেছিলেন। তারা মাদাইনে সালমান ফারসীর সাথে দেখা করতে চাইলেন। তাকে পাওয়া গেল একটি খেজুর ফল বিতানে। তিনি সেখানে বসে খড়ের ঠোঙ্গাঁ তৈরী করছিলেন। তারা তাঁর কাজ দেখে বিস্মিত হলেন। একজন বললেন- আপনি আমীর। আপনার বেতন নিশ্চিত আর আপনি এ কাজ করছেন ?

সালমান ফারসী (রাঃ) জবাব দিলেন - আমি নিজের হাতে অর্জিত আয় থেকে জীবনযাপন পছন্দ করি।

আহার

সালমান ফারসী (রাঃ) এক দিন দাওয়াত খেতে গিয়েছিলেন। যে খাবার তাকে দেওয়া হয়েছিল তা থেকে তিনি অল্প আহার করলেন। আর একটু তাকে খেতে চাপাচাপি করছিল নিমন্ত্রণকারী মেজবান। সালমান ফারসী (রাঃ) বললেন- যা খেয়েছি তাই আমার জন্য যথেষ্ট। আমার জন্য কাফি। আমি আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন- যে দুনিয়ায় তার পেট পূর্ণ করে- পরকালে সে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকবে। হে সালমান ! ঈমানদারদের জন্য এই দুনিয়া একটি কারাগার এবং কাফেরের জন্য দুনিয়া হল জান্নাত।

www.nagorikpathagar.org

মধ্যমপন্থা

সালমান ফারসী (রাঃ) অপরের ক্ষেত্রে জীবন যাপনে সংসারের নিস্পৃহতা বিরোধী ছিলেন। একদিন তিনি আবু দারদার স্ত্রীকে পেলেন দারিদ্রের নিস্পেষনে করুণ অবস্থায়। তিনি ধর্মীয় ভ্রাতৃবধুকে জিজ্ঞাসা করলেন - তোমার এই করুণ অবস্থা কেন? আবু দারদার স্ত্রী বললেন- আপনার ভাইয়ের তো এই দুনিয়ার কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই।

যখন আবু দারদা (রাঃ) গৃহে এলেন তিনি সালমান ফারসীকে স্বাগতম জানালেন এবং তাকে খাদ্য পরিবেশন করলেন। সালমান (রাঃ) আবু দারদাকেও খেতে বললেন। আবু দারদা (রাঃ) জানালেন, আমি তো রোযা রেখেছি। সালমান ফারসী (রাঃ) বললেন আমি কসম করছি যে, আমি কিছু খাব না যে পর্যন্ত না তুমি খাও।

সে দিন রাত্র সালমান (রাঃ) আবু দারদার গৃহে কাটালেন। রাতের বেলায় দেখা গেল আবু দারদা ইবাদতের জন্য উঠে গেলেন। সালমান (রাঃ) তাকে ধরে ফেললেন এবং বললেন- আবু দারদা ! তোমার উপর তোমার প্রভুর অধিকার আছে। তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে। তোমার উপর তোমার শরীরেরও হক আছে। প্রত্যেকেরই নিজ পাওনা আদায় কর।

প্রত্যুষে দু'জন এক সঙ্গে নামাজ পড়লেন এবং সকাল বেলা নবী করিম (সাঃ) এর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। পূর্ব রজনীর ঘটনাবলী সালমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহকে অবহিত করলেন। সালমান (রাঃ) যা বলেছেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাই যথাযথ বলে প্রত্যয়ন করলেন।

সালমান (রাঃ) এবং আবু দারদা (রাঃ) দু'জনে পরস্পরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের বন্ধনে জীবনব্যাপী আবদ্ধ ছিলেন। যখন তারা দূরে থাকতেন, তখন লোক মাধ্যমে এবং পত্র যোগাযোগে সংযোগ রক্ষা করতেন। তাদের সম্পর্কের মধ্যে ছিল স্পষ্টবাদীতা ও স্বচ্ছতা।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) একবার সালমান ফারসীকে লিখলেন - তিনি যেন অতি দ্রুত এবং অবিলম্বে যেন পবিত্র ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন। উত্তরে সালমান (রাঃ) জানালেন মাটির মধ্যে পবিত্রা নেই। মানুষের কর্মই তাকে পবিত্রতা দান করে।

জ্ঞানচর্চা

রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ইশার নামাযের পর দীর্ঘ সময়ে জেগে থাকতেন না। ব্যতিক্রম ঘটত একটি ক্ষেত্রে। সালমান ফারসীকে পেলে গভীর বা অধিক রাত পর্যন্ত তিনি

www.nagorikpathagar.org

দ্বীনি বিষয়ে আলোচনায় মগ্ন থাকতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন "রাত্রে সালমান (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ্‌র সঙ্গে আলোচনার জন্য আসতেন, তিনি আমাদের উপরে তাকে প্রাধান্য দিতেন। (উসুদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩১)।

সালমান (রাঃ) ছিলেন শিক্ষা গ্রহণে অতি উৎসাহী। পরিণতিতে মুসলিমদের মধ্যে একজন প্রথম সারীর বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিতে উন্নীত হয়েছিলেন।

সালমান তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার জন্য সুবিখ্যাত ছিলেন। তার সম্বন্ধে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন- সালমান হল মহান লোকমানের ন্যায়।

হযরত কাব আল আহবার (রাঃ) বলেছেন আল্লাহ্ সালমানকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে পূর্ণ করেছেন। সে একটি মহা সমুদ্রের ন্যায়। যা কোন দিন শুষ্ক হয় না।

হযরত আলী (রাঃ) সালমানের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে বলেন - সালমান (রাঃ) ছিলেন প্রথমের ইলম (পূর্ববর্তী কিতাব) এবং শেষের ইলম (কুরআন) সম্পর্কে জ্ঞানী। তিনি ছিলেন এমন এক সমুদ্র যা কখন সিঞ্চন করা হয়নি। (উসদুল গাবা, ২য় খন্ড পৃঃ ৩৩১)।

হযরত আলী (রাঃ) তাঁর সম্বন্ধে বলেন, সালমান ইলম ও হিকমাতে লোকমান হাকীমের সমপর্যায়ে ছিলেন"। (ইবনে আব্দুল বার ঃ আল ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৩৭)।

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) ছিলেন মৃত্যু শয্যায়। এক ব্যক্তি তাঁর অন্তিম অবস্থা দেখে রোদন শুরু করল। হযরত মুয়াজ জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কাঁদছ কেন? হযরত মুয়াজ (রাঃ) ছিলেন একজন প্রজ্ঞা সম্পন্ন ব্যক্তি। লোকটি উত্তরে বলল কারণ আমি আপনার নিকট থেকে বহু বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেছি।

মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) তাকে আশ্বস্ত করে বললেন কেঁদো না। আমার মৃত্যুর পর চার ব্যক্তির নিকট জ্ঞানের অনুসন্ধান করিও। তারা হলেন (১) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (২) আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম (৩) সালমান ফারসী (৪) আবু দারদা। হে আল্লাহ্ ! তুমি তাদের উপর রাজী থাক। (ইবনে সাদ, তাবাকাত; ৪ খন্ড, পৃঃ ৮৬) (সিয়ারুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৫)।

সালমান (রাঃ) অগ্নি উপাসকদের ধর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছিলেন। খ্রীষ্টান ধর্মে তাঁর ব্যাপক জ্ঞান ছিল। আল কুরআন তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহর অতি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্‌র জীবদ্দশায় সালমান (রাঃ) কুরআনের বেশ কিছু অংশ ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। বিদেশী ভাষায় আল কুরআন অনুবাদকারীদের মধ্যে সালমানের নাম সকলের শীর্ষে।

www.nagorikpathagar.org

সালমান (রাঃ) যা জানতেন তা অন্যদের মধ্যে প্রচারে ছিলেন খুবই আগ্রহী।

ধর্মের প্রতি সালমান ফারসী (রাঃ) এর তীব্র আগ্রহ সম্বন্ধে বলা হয়েছে "সত্য ধর্মের অনুসন্ধান ও কামনায় পিতামাতার অপার স্নেহ ও স্বদেশ ভূমির মায়া ত্যাগ করিয়া এক রকম সহায় সম্বলহীন অবস্থায় তিনি যেরূপ দেশ দেশান্তরে ছুটিয়া বেড়াইয়াছেন তা তাঁহার ধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার প্রমাণ বহন করে"। (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৪ খণ্ড, ২য় ভাগ; ৯৮ পৃঃ)।

পারস্যের মাদায়ন শহরের সিফন (ctesiphon) নামক স্থানে তিনি এক মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে প্রায় এক হাজার লোক তাঁর চার দিকে একত্রিত হল। তিনি তাদেরকে বসিয়ে সূরা ইউসুফ তেলাওয়াত করা শুরু করলেন। তারপর অন্যান্য সূরা। লোকেরা নিজেদের মধ্যে চুপে চুপে বলাবলি করতে লাগল আল-কুরআন তো আমাদের কাছে আছে। আমরা তো নিজেরা তিলাওয়াত করতে পারি। লোকেরা তাই আস্তে আস্তে সরে পড়তে লাগল। এক পর্যায়ে এক শতের বেশি লোক তাঁর চার দিকে রইল না।

এতে সালমান ফারসী (রাঃ) অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং রাগত স্বরে বললেন- আমার সুন্দর সুন্দর মজাদার কাহিনী তোমরা শুনার জন্য বসে থাক। আর যখন আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করি তোমরা আস্তে আস্তে সরে পড়। তোমাদের উপর কি আল্লাহর লানত নাযেল হবে না?

সহনশীলতা

একদা এক মুসলিম সেনাদলের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন সালমান (রাঃ)। মুসলিম বাহিনী সে এলাকা দখল করে মুসলিম সুশাসন কায়েম করেন। এক জায়গায় কয়েকজন ব্যক্তি উপবিষ্ঠ ছিলেন। একজন আল-কুরআন থেকে সূরা মরিয়ম তিলাওয়াত শুরু করলেন।

একজন অমুসলিম তার তিলাওয়াত শুনে হযরত মরিয়ম এবং তাঁর পুত্র হযরত ঈসা সম্পর্কে অত্যন্ত অশালীন মন্তব্য করেন। এতে মুসলিমগণ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হল। তারা লোকটিকে প্রহার শুরু করে দিল। এক পর্যায়ে তার দেহ থেকে রক্ত ঝরে পড়ল।

বহিরাগত লোকটি সালমানের নিকট গেল এবং বিচার প্রার্থনা করল। সুবিবেচনা, ইহসান, ইনসাফ এবং সুবিচারের জন্য সালমানের ছিল খ্যাতি। যিনি অধিকারহারা এবং নিজেকে ক্ষুদ্র অনুভব করতেন, তারা তার কাছে গিয়ে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার আবেদন জানাতে পারতেন।

www.nagorikpathagar.org

সালমান (রাঃ) আহত লোকটিকে নিয়ে মুসলিমদের কাছে গেলেন এবং লোকটিকে প্রহারের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মুসলিমদের মধ্যে একজন বলল- আমরা সূরা মরিয়মের তিলাওয়াত শুনছিলাম। আর এই লোকটি বিনা প্ররোচনায় হযরত মরিয়ম এবং তাঁর পুত্র সম্বন্ধে অবমাননাসূচক বক্তব্য পেশ করে। তাদেরকে অপমান বা বেইজ্জতী করেছেন।

মুসলিমদের জবাব শুনে সালমান (রাঃ) অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। অমুসলিমদের মধ্য হতে যারা জিম্মী, নিরাপত্তা প্রাপ্ত তাদেরকে সম্মান ও সমীহ করার নির্দেশ দিলেন এবং সবুরের আহ্বান জানালেন। তিনি তাদেরকে কুরআনের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি পাঠ করলেন, "তাদেরকে গালিগালাজ কর না যারা আল্লাহ ভিন্ন অন্যের উপাসনা করে। যদি তা কর, তারা ঘৃণা এবং অনাচারের কারণে আল্লাহর অবমাননা করবে (সূরা- আনআম, ৬ ঃ ১০৮)

নিয়মিত সালাত

একদিন সালমান ফারসী (রাঃ) এবং আরেক ব্যক্তিসহ আল্লাহর নবী (সাঃ) এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ঠ ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বৃক্ষটি হতে একটি শুকনো ডাল ভেঙ্গে নিলেন এবং তা নাড়া দিলেন। সবগুলো পাতা ক্রমশঃ ঝরে গেল। তিনি সালমান ফারসীকে জিজ্ঞাসা করলেন- হে সালমান ! তুমি কি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না- কেন আমি এমনটি করলাম ?

সালমান (রাঃ) তখন জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! কেন এমনটি করলেন? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন-যখন কোন মুসলিম উযু করে এবং মনোযোগ সহকারে ভালভাবে করে। অতঃপর ৫(পাঁচ) বার নির্দেশিত সালাত আদায় করে, তখন তার গুণাহগুলো এভাবে ঝরে পড়ে -যেভাবে শুকনো পাতাগুলো ডাল থেকে ঝরে পড়েছে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করলেন দিনের দুই প্রান্তভাগে সালাত কায়েম কর এবং রজনীর প্রথম অংশে। অবশ্যই ভাল কর্ম অপকর্ম তাড়িয়ে দেয়, যারা আল্লাহর দিকে মনোযোগী এটা তাদের জন্য সরল বাণী।" সূরা হুদ ১১ ঃ ১১৪।

জিক্‌র

সালমান (রাঃ) যা জানতেন তা আমলে পরিণত করতেন। তিনি একদল মুসলিমের সঙ্গে উপবিষ্ঠ ছিলেন। তারা সকলে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র জিকির

www.nagorikpathagar.org

করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদের নিকটে থামলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা মন দিয়ে কি পাঠ করছিলে ?

তারা বললেন-হে আল্লাহ্‌র রাসুল ! আমরা জিকির করছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, যে শব্দগুলো উচ্চারণ করছিলে তাই করতে থাক। অবশ্যই আমি দেখছিলাম যে, আল্লাহর অনুকম্পা ও আশিষ তোমাদের উপর বর্ষিত হচ্ছে। আমি অবশ্যই তোমাদের সাথে এর অংশীদার হতে চাই।

তারপর তিনি বললেন- প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তোমাদের মত লোক আল্লাহ আমার উম্মতের মধ্যে তৈরী করেছেন। তোমাদের মধ্যে প্রশান্তি ও আমার অন্তঃকরণে সবর অনুভব করতে আল্লাহ আমাকে নিদেশ দিয়েছেন।

বরাইদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন, আমার রব চার ব্যক্তিকে ভালোবাসার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এরা হলেন - আলী, আবু জারব, মিকদাদ ও সালমান। (আল-ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৩৬)।

আনাস ইবনে মালিক বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন, জান্নাত তিন ব্যক্তি জন্য প্রতীক্ষা করে। তারা হলেন আলী, আম্মার ও সালমান। (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩১)।

সালমান (রাঃ) ছিলেন তাঁর বিশ্বাসে অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ। যখন তিনি অগ্নী উপাসক ছিলেন তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ অগ্নী পূজারী। খ্রীষ্টান থাকাকালে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ সংসার ত্যাগী খ্রীষ্টান। ইসলাম গ্রহণ করার পরেও তিনি হন ইসলামের পরিপূর্ণ নমুনা এবং খাঁটি মুসলিম।

সালমান (রাঃ) অভিজাত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। আল্লাহ প্রদত্ত বুদ্ধি এবং জ্ঞান যা সালমানকে দিয়েছেন তা দিয়ে বিশাল ফারস্য সম্রাজ্যের উচ্চ স্তরে ক্ষমতাশীল এবং প্রাচুর্যময় জীবন যাপন করতে পারতেন। কিন্তু সত্যের আবেদন ও ক্ষুধা তাঁর মধ্যে ছিল প্রবল। সত্যের সন্ধানে তিনি আরামপ্রদ এবং সুখী জীবন যাত্রার সকল সম্ভাবনা পরিহার করে স্বেচ্ছায় গৃহ হারা হন।

সুদীর্ঘ কাল তিনি দাসত্বের নির্মম শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলেন। হযরত উসমানের খিলাফতকালে ৩৬ হিজরীতে ৭৭ বছর বয়সে মাদাইন শহরে সালমান ফারসী (রাঃ) জান্নাতের পথে ইহকালের মায়া পরিত্যাগ করে মহাপ্রয়ান করেন। হযায়ফা ইবনুল ইয়ামানের পাশে তাকে দাফন করা হয়। মাদাইনে এখনও তাঁর মাজার আছে।

www.nagorikpathagar.org

নির্যাতীত হযরত বিলাল (রাঃ)

বিলালের (রাঃ) পিতা রাবাহ ছিলেন একজন আরব। মাতা হামামাহ ছিলেন আবিসীনিয়ান হাবশী। বিলালের পিতার নাম 'রাবাহ' শব্দটি 'রিবাহ'ও উচ্চারিত হয়। মাতার নাম সংযুক্ত করে তাকে বিলাল ইবনে হামামাহও বলা হয়। তাঁর ভগ্নী গাফরা ছিলেন জনৈক আব্দুল্লাহর ক্রীতদাসী। খালিদ নামে তাঁর এক ভ্রাতা ছিলেন।

বিলালের গাত্র বর্ণ ছিল কৃষ্ণাভ বাদামী হাবশীদের ন্যায় গাঢ় কৃষ্ণ নয়। কারণ তাঁর পিতা ছিলেন স্বেতকায় আরব।

বিলাল ছিলেন দীর্ঘ দেহী কিন্তু হালকা পাতলা। তাঁর বক্ষ ছিলো প্রশস্ত। কেশরাজি কিন্তু ছিল ঘন। কিন্তু কুঞ্চিত বা কোকড়ানো নয়। নাকও চ্যাপ্টা ছিলনা।

দাসত্ব

হযরত বিলাল (রাঃ) এবং তাঁর পিতা প্রথম দিকে কার দাস ছিলেন তা নিশ্চিত নয়। এ ব্যাপারে বিভিন্নরূপ বর্ণনা আছে।

এক বর্ণনা মতে বিলালের পিতা-মাতা দাসরূপে মক্কাবাসী বনি জুমাহা পরিবারে মাত্র কয়েক দিনারের বিনিময়ে বিক্রয় হন। বিলাল (রাঃ) জন্মগতভাবে দাস ছিলেন। তরুণ, কিশোর ও যৌবন কাল তাঁর দাস হিসেবেই অতিবাহিত হয়। তাঁর জন্মস্থান ছিল 'সারা' মহল্লায়।

কাবা গৃহের অনতিদূরে আম্বিয়া পাহাড়ে সারা নামক শীর্ষে হযরত বিলালের নামে একটি মসজিদ আছে। এটা তাঁর বাসগৃহ ছিল বলে অনেকের ধারণা।

ইসলাম গ্রহণ

এক বর্ণনায় হযরত বিলাল (রাঃ) কে ৮ম মুসলিম বলা হয়েছে। আটজন হলেন (১) হযরত খাদিজা, (২) আবু বকর, (৩) আলী, (৪) আম্মার (৫) উসমা, (৬) সুহাইব, (৭) মিকদাদ, (৮) বিলাল। (আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ ঃ হযরত বিলাল; [ইংরেজী পুস্তক]; পৃঃ নং- ২২)। এ বর্ণনায় হযরত যায়েদ বিন হারিছাহ, আবু জর গিফারী, খাব্বাব ইবনে আল আরাতের নাম নেই।

ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর মনিব ছিল উমাইয়া ইবনে খালফ। সম্ভবত আবু জাহলের এক আত্মীয়ার কাছ থেকে উমাইয়া বিলালকে ক্রয় করে। ইসলাম গ্রহণের

www.nagorikpathagar.org

প্রতিক্রিয়ায় তাঁর প্রভু উমাইয়া ইবনে খালফের নির্যাতন বিলালের উপর ছিল নিষ্ঠুর এবং ভয়াবহ।

চাবুকাঘাত

তৌহিদী ধর্ম গ্রহণ করেছে কিনা উমাইয়্যা জিজ্ঞাসা করায় হযরত বিলাল (রাঃ) অকপটে তা স্বীকার করেন। অকথ্য ভাষায় বকাবকি, ধমকা ধমকি করেও উমাইয়ার চিত্ত প্রশান্ত হয়নি। বরং গালা-গালির পর শুরু হয় চাবুকের আঘাত। নির্মম আঘাতে হযরত বিলালের দেহের চর্ম বহু স্তরে এমনভাবে ফেটে যায় যে, সারাটি দেহ রক্তাক্ত হয়।

আঘাতে চৌচির হযরত বিলাল (রাঃ) এর রক্তমাখা গাত্র দেহ ভয়াবহ এবং মর্মন্তুদ রূপ ধারণ করে। অর্ধ মৃত দেহটিকে টেনে হেঁচড়ে আবর্জনাপূর্ণ কক্ষে আবদ্ধ করে রাখা হয়।

কয়েক ঘন্টা পর কক্ষ থেকে বরে করে এনে তাকে পুনরায় বেত্রাঘাত করা হয় এবং নতুন ধর্মমত ত্যাগ করে লাত, মানাত, উযযা, হুবল এর অনুসারী বলে ঘোষণা করতে বলা হয়। কিন্তু হযরত বিলাল (রাঃ) ছিলেন নিরুত্তর। তখন তাকে কিরূপ অত্যাচার হবে তারও বর্ণনা দেয়া হয়।

উত্তপ্ত বালুকার উপর পাথর চাপা

অত্যাচারের একটি ধরণ ছিল - দ্বি প্রহরের মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকার উপর চিত করে বুকের উপর ভারি পাথর চাপা দিয়ে রাখা। এরূপ এবং অন্যান্যভাবে তাঁর উপর অত্যাচার করা হত। নির্দেশ দেয়া হত লাত ও উজ্জার পূজা করতে এবং রাসূলুল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে। তা না করা হলে এরূপ অত্যাচারের মধ্যে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এরূপ ভীতিও দেখান হত।

বিবিধ মর্মন্তুদ নির্যাতন চলাকালেও তিনি চিৎকার করে বলতেন "আহাদ', আহাদ', অর্থাৎ এক আল্লাহ্ এবং অদ্বিতীয় প্রভু। একমাত্র প্রভুর এবাদতই আমি করি। (ইবনে হিশাম; আসসিরাতুন নবুবিয়্যাহ, মিশর, প্রথম খণ্ড, পৃঃ-৩৩৪)।

বিলালকে জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ করা হবে। হস্ত পদ বেঁধে কঙ্করময় কন্টকাকীর্ণ পথে উট ঘোড়ার পায়ে বেঁধে উট ঘোড়া দৌড়ান হবে। ইত্যাদি প্রচলিত শাস্তির ভয় দেখান হয়। খাদ্য ও পানি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

www.nagorikpathagar.org

দুষ্ট ছেলেদের নির্যাতনের শিকার

ব্যথা বেদনা এবং ক্ষুধায় কাতর বিলালকে মক্কার দুষ্ট ছেলেমেয়ের হাতে ছেড়ে দেয়া হত। তারা তাকে টেনে হেঁচড়ে পদাঘাতে জর্জরিত করত।

পথে-ঘাটে, অলিতে-গলিতে হযরত বিলালকে টানাটানি করে হৈ চৈ আমোদ প্রমোদেও দুষ্ট ছেলেরা লিপ্ত হত। যাদের হাতে বেত ছিল তারা তাকে বেত্রাঘাত করত। যার ইচ্ছা কঙ্কর নিক্ষেপ করে। এরূপ অত্যাচারে, অনাহারে, হযরত বিলাল (রাঃ) হয়ে উঠতেন অর্ধমৃত।

তাঁকে আঘাতে, প্রহারে জর্জরিত করে আনন্দ উপভোগের পর ক্লান্ত বালক কিশোরেরা প্রচন্ড সূর্যতাপে ফেলে রাখত। অর্ধচেতন শরীর পিপাসায় হত ক্লান্ত।

বিবিধ নির্যাতন

দুষ্ট বালকদের হাতে সমর্পন করে তাদের আনন্দ বিনোদন ছাড়াও হযরত বিলালের উপর পালাক্রমে প্রহার করার জন্য লোক নিয়োগ করা হত।

উমাইয়া অত্যাচারের নতুন নতুন পদ্ধতি বের করতো। লোহার বর্ম এবং পোশাক পরিয়ে প্রখর রৌদ্রে বেঁধে রাখত। কখনও কখনও উটের চামড়ার ভিতরে ভরে শ্বাসরূদ্ধ করতে চাইতো।

মক্কার নিকটে আরব মরুর ভয়াবহ উষ্ণতম স্থান ছিল বহতা। এখানে মরুর প্রখরতায় মৃত্যু ছিল স্বাভাবিক। বহতার উত্তপ্ত বালুকার উপর উর্ধ্বমুখি শয়ন করিয়ে তাঁর বুকে ভারি পাথর চাপা দেওয়া হত।

কন্টকময় বাবেল গাছের কন্টক যুক্ত ডালের বিছানায় তাকে শায়ীত করে নিয়মিত দেহপরি প্রস্তরশীলা চাপা দেওয়া হত। খানা বন্ধ করে দেয়ার ফলে তাঁর দেহ হয়ে উঠেছিল অস্থি চর্মসার।

যখন তাঁর উপরে কাফেরগণ নির্যাতন চালাতো তখন তার প্রতিক্রিয়া তিনি ব্যক্ত করতেন 'আহাদ' 'আহাদ' বলে। দেহে এবং রসনায় শক্তি থাকা পর্যন্ত নির্যাতনের ভয়ে তিনি কখনও তাদের প্রশ্নের জবাবে চুপ থাকতেন না।

হযরত আবু বাকার (রাঃ) এবং আলীর (রাঃ) উপরে মক্কাবাসীদের অত্যাচারের তীব্রতা ছিল কম। কারণ বনু হাশিম এ বনু বাকার গোত্রের প্রতিক্রিয়ার ভয় ছিল। কিন্তু দাসদের উপর কুরাইশদের অত্যাচার ছিল অত্যন্ত নির্মম এবং মর্মান্তিক।

এরূপ অত্যাচারে মৃত্যু ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল বিপরীত। দিনের পর দিন অমানষিক নির্যাতন, অনাহার, অনিদ্রায় তাঁর মৃত্যু ঘটেনি।

www.nagorikpathagar.org

উম্মুল মু'মিনিন খাজিদাতুল কোবরার পিতৃব্য পুত্র নাছারা ওয়ারাকা বিন নওফল স্বচক্ষে এ অমানুষিক অত্যাচার লক্ষ্য করে হযরত আবু বকরের নিকট তা বর্ণনা করেন। অভিভূত হযরত আবু বাকার (রাঃ) তখন উমাইয়ার নিকট বিলালকে ক্রয় করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু উহামইয়্যা রাজী হয়নি।

বিলালের উপর অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী মক্কার লোকদের মুখে মুখে প্রচারিত হতে থাকে।

হযরত বিলালের ন্যায় মক্কার দাসগণ দাসত্ব থেকে মুক্তির লক্ষ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন নি। বরং ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর তাদের উপর অত্যাচারের তীব্রতা বেড়ে যেত হাজার গুণ। তাদের ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিল খালেছ তৌহিদী চেতনা।

হযরত আবু বাকার (রাঃ) তখন হযরত বিলালের মুক্তির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্‌র পিতৃব্য হযরত আব্বাসের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

বিলালের ব্যাপারে আবু বাকারের আগ্রহ দেখে উমাইয়া অসম্ভব রূপ চড়া দাম হাঁকলেন। তিনি অস্থিচর্মসার অসুস্থ, দুর্বল বিলালের পরিবর্তে চাইলেন একটি দাস যে ইসলাম গ্রহণ করেনি। তদুপরি চাইলেন রৌপ্য মুদ্রা। তখন মক্কায় স্বাস্থ্যবান দাসের মূল্য ছিল ১০/১২ তোলা রৌপ্য।

দ্বীনদার দাসের বদলে একটি বেদ্বীন দাস, তদুপরি ১২০ তোলা রৌপ্য হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে আদায় করে নিয়ে বিলালকে হস্তান্তর করেনল।

কোন কোন বর্ণনা মতে হযরত আবু বকর (রাঃ) ৫ অথবা ৭ অথবা ৯ উকিয়া স্বর্ণের বিনিময়ে হযরত বিলালকে ক্রয় করেন। ৭ উকিয়া ছিল ২৩ গ্রাম স্বর্নসম।

হযরত আবু বাকারের বদান্যতা ও উদারতায় হযরত বিলাল (রাঃ) বানু জুমাহ গোত্রের দাসত্ব থেকে মুক্তি পান। হযরত আবু বাকার (রাঃ) তাঁর একটি সবল স্বাস্থ্যবান গোলামের বিনিময়ে হযরত বিলালকে গ্রহণ করেন। তাঁর ঐ গোলামটি ইসলাম গ্রহণ করতে সম্মত ছিল না।

এরূপ অকর্মন্য অপ্রয়োজনীয় দাস এতো চওড়া মূল্য পেয়ে উমাইয়া পরম তৃপ্তির হাসি হাসল এবং আবু বকরকে যে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ করে জয়লাভ করেছে সে বিজয় আনন্দ প্রকাশ করল।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন-"উমাইয়া বিজয়ী তুমি হওনি, বিজয়ী হয়েছি আমি"। হাজার উকিয়া স্বর্ণ মুদ্রা চাইলেও আমি বিলালকে ক্রয় করতাম। স্বর্ণ দিয়ে বিলালের মূল্য হয় না। বিলালের ঈমানের মূল্য আমার নিকট যে কত বেশি তা তুমি কল্পনাও করতে পার নি। এ কেনা বেঁচায় আমি ঠকিনি, তুমি ঠকেছো। তুমি এক হাজার তোলা রৌপ্য দাবী করলেও আমি তা দিতাম। কারণ ততটুকু সামর্থ্য আমার

www.nagorikpathagar.org

ছিল। এবার বুঝে দেখ-এ ক্রয়-বিক্রয় এবং বদলা-বদলিতে কার জয় হয়েছে? এবং কার হার হয়েছে?"

দাসত্ব হতে মুক্তির পর হযরত আবু বাকার (রাঃ) বিলালকে তাঁর ষ্টোর কিপার নিয়োগ করেন। রাসূলুল্লাহ্‌র জন্য বিলালের পাগলপারা ভাব দেখে তিনি রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) খিদমতের জন্য বিলালকে (রাঃ) ছেড়ে দেন।

হিজরাত

আবু তালিব এর গুহা থেকে মুক্তির পর রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) মুসলিমদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দান করেন। হযরত বিলাল (রাঃ) হাবশী হয়ে পিতৃ ভূমির আকর্ষণেও রাসূলুল্লাহ্‌র সান্নিধ্য ত্যাগ করেননি। অন্য দিকে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) গোপনে মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করবেন- এই খবর যারা জানতেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত বিলাল (রাঃ) এবার তিনি কালবিলম্ব না করে রাসুলুল্লাহ্‌র পূর্বেই মদীনায় চলে যান। পথকষ্ট, স্বল্পাহার এবং অন্যান্য কারণে মদীনায় পৌঁছে হযরত বিলাল (রাঃ)। অসুস্থ এবং জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন।

মদীনায় হযরত বিলাল (রাঃ) মাদানী সাহাবী সা'দ ইবনে খাইসামা এর গৃহে অবস্থান করে প্রিয় নবীর অপেক্ষায় থাকেন। আনসার এবং মুহাজিরদের হৃদ্যতা এবং সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) একজন আনসার ও একজন মুহাজিরের মধ্যে পারস্পরিক বিশেষ ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন প্রথা প্রবর্তন করেন।

হযরত বিলালের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক হয় খাছআম গোত্রের আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবু রাওয়াহার সঙ্গে। এই ভ্রাতৃত্ব চুক্তি ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য-কৃষি বিষয়ক, সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য সহযোগীতা সম্পর্কীয়। যদিও আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্দুর রহমানের সঙ্গে হযরত বিলালের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভ্রাতৃত্ব চুক্তি সম্পাদিত হয়, কিন্তু হযরত বিলাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত সহকারী এবং খাদিম হিসেবেই তাঁর দায়িত্ব পালন করেন।

মক্কায় উবায়দা ইবন আল হারিস ইবনে আব্দুল মোত্তালিব এবং আবু উবায়দা ইবনে জাররা এর সঙ্গেও বিলালের ভাতৃত্ব চুক্তি হয়। তবে মদীনায় আবু রাওয়াহা আল খাইসমি'র সঙ্গে সম্পর্ক ছিল আমৃত্যু।

বিবাহ

হযরত কাতাদা বর্ণনা করেছেন হযরত বিলাল (রাঃ) বানু যোহরা গোত্রের এক মহিলাকে বিবাহ করেন। তাঁর এই স্ত্রীর নাম ছিল হিন্দাল খাওলানীয়া। সিরিয়ায়ও

www.nagorikpathagar.org

তিনি একটি বিবাহ করেন"।

ঐতিহাসিক ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন যে "হযরত আবু বাকারের পুত্রগণ রাসূলুল্লাহ্‌র কাছে এসে আরজ করেন যে, "আমাদের বোনকে দয়া করে কার সাথে বিবাহ দিয়ে দিন"। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, "বিলালকে তোমাদের পছন্দ হয়?" ইবনে আবু বকর (রাঃ) একথা শুনে কিছু না বলে চলে গেলেন। এর পর আর দু'বার ইবনে আবু বকর (রাঃ) মহা নবীর খিদমতে এসে একই আরজ পেশ করেন এবং একই রূপ উত্তর পান। সর্বশেষ বার তিনি বলেন, আপনার ইচ্ছাই আমাদের মত"।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত বিলালের সাথে হযরত আবু বাকারের কন্যাকে বিয়ে দিয়ে দেন। (ইবন সা'দ ঃ তাবকাত)।

ঐতিহাসিক আবু ইসহাকের মত হযরত বিলালের কোন সন্তান সন্ততি ছিল না। যদিও তিনি তিনটি বিবাহ করেছিলেন। তবে তিনি আবু আবদুল্লাহ নামেও অবিহিত হতেন।

হযরত উমর (রাঃ) হযরত বিলালকে খিলাফতের দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণের অনুরোধ করেন। কিন্তু নিয়মিত দায়িত্বে তিনি উৎসাহী ছিলেন না। বরং অনিয়মিত যিহাদেই তাঁর উৎসাহ ছিল অধিক।

মুসলিমদের সিরিয়া অভিযানে হযরত বিলাল (রাঃ) অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর দ্বীনি ভাই আবু রাওয়াহা হযরত বিলালের ওয়াজিফা গ্রহণ করতেন।

ইন্তেকাল

মদীনা ত্যাগ করে সিরিয়া আসার পর হযরত বিলাল (রাঃ) তাঁর ধর্মীয় ভ্রাতা আবু রাওয়াহার সঙ্গে খাওরান নামক স্থানে অবস্থান করেন। প্লাগ মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে হযরত বিলাল ইন্তেকাল করেন। কার কার মতে তিনি সমাধিস্থ হন হালভে। কিন্তু দামেস্কে সমাধিস্থ হওয়ার ধারণাটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য। তিনি ৬০ বছরের অধিক বেঁচেছিলেন। ১৭ হিজরী এবং ২১ হিজরীর মধ্যে তিনি ইন্তেকাল করেন।

অন্তিম শয্যায় তাঁর চোখ মুখ ছিল আনন্দজ্জ্বল। কিন্তু তাঁর স্ত্রী গভীর বেদনায় অশ্রু বিসর্জন করছিলেন। স্ত্রীকে সান্তনা দিয়ে হযরত বিলাল (রাঃ) বলেন - "তোমরা কেন অশ্রু বিসর্জন করছ? আমি তো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং আমার পুরোনো সঙ্গীদের সঙ্গে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর পুনঃমিলনের আনন্দে উদ্বেল। ইন্‌শাআল্লাহ্। আগামী কাল্যই তাদের সকলের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হবে। হযরত বিলালকে দামেস্কের আল সাগীর গোরস্থানে দাফন করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

মুজাহিদ হযরত বিলাল (রাঃ)

দ্বিতীয় হিজরী ১৭ই রামযান মদীনা থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে বদর নামক উপত্যকায় বদর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এই যুদ্ধে ৩২৪ জন মুসলিম (৮৬ জন মহাজীর এবং ২৩৮ জন আনসার) অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ যুদ্ধে ৩১৩ জন মুজাহিদের অংশগ্রহণের ধারণাটি ব্যাপকভাবে গৃহিত।

বদর যুদ্ধে হযরত বিলাল (রাঃ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এক পর্যায়ে তিনি তাঁর নিষ্ঠুর পূর্বতর প্রভু উমাইয়া ইবন খালফকে দেখে ফেলেন।

তখন তিনি উমাইয়া খালফ, উমাইয়্যা খালফ চিৎকার করতে করতে উমাইয়্যার দিকে এগিয়ে যান। তিনি বলতে থাকেন উমাইয়া যদি বেঁচে যায় আমার বেঁচে থাকা অর্থহীন।

বদর

হযরত বিলাল (রাঃ) মুসলিমদেরকে পলায়নপর উমাইয়া ইবনে খালফের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি স্বয়ং উমাইয়া ইবনে খালফকে আক্রমণ করেন। অন্যরা আক্রমণ করেন উমাইয়ার পুত্রকে।

ভীত সন্ত্রস্ত উমাইয়া একটি পাহাড়ের অন্তরালে লুকিয়ে যান। হযরত বিলাল (রাঃ) উমাইয়া ইবনে খালফকে আবিস্কার করে হত্যা করেন। তার পুত্রও এ যুদ্ধে নিহত হয়। বদর যুদ্ধে ৭০ জন কাফির নিহত হয়েছে।

দয়া পরবশ হয়ে হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) উমাইয়া ইবনে খালফ এবং তার পুত্রকে পলায়নের সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন। তিনি তাদের পক্ষে কিছুটা তদবীরও করেছিলেন। কিন্তু ইসলামের এত বড় দুশমনের ব্যাপারে হযরত বিলাল (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত কঠোর।

আর একটু অগ্রসর হলে হযরত বিলাল (রাঃ) আব্দুর রহমান আউফের উপর তলোয়ার চালাতেও দ্বিধা করতেন না। এমন ছিল সত্যের প্রতি তাঁর আনুগত্য।

উমাইয়া ইবন খালফ এর হত্যার পর হযরত আবু বাকার (রাঃ) হযরত বিলালকে কুরআনের আয়াত উদ্ধৃতি করে মোবারকবাদ জানান।

www.nagorikpathagar.org

উহুদ

উহুদ যুদ্ধে হযরত বিলালের আযান ও ইকামতের পর রাসূলুল্লাহ্‌র ইমামতিতে মুসলিমগণ ফাজরের নামাজ আদায় করেন এবং তারপরে যুদ্ধ শুরু হয়।

খন্দকের যুদ্ধে শুরুর দিন মুসলিমদের আছরের নামাজ কাযা হয়ে যায়। দিনের শেষে বাতহান নামক স্থানে মুসলিমগণ হযরত বিলালের আযানের পর মাগরিবের নামায এবং আছরের নামাজ আদায় করেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তানুযায়ী রাসূলুল্লাহ ৬ষ্ঠ হিজরীতে উমরাহ না করে ১৪০০ সাহাবী সহ মদীনায় ফিরে আসেন।

মক্কায়

পরবর্তী বছর ৭ম হিজরীতে সন্ধির শর্ত অনুযায়ী মুসলিমগণ মক্কার গমন করেন এবং উমরাহ পালন করেন। মুসলিমদের উমরাহ পালন কালে রাসূলুল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে হযরত বিলাল (রাঃ) আযান ঘোষণা করেন। মক্কায় এটাই ছিল মুসলিমদের সর্বপ্রথম আযান।

অষ্টম হিজরীতে বিনা যুদ্ধে মুসলিমগণ মক্কা জয় করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) ফাদা নামক স্থান থেকে মক্কায় প্রবেশ করেন। তখন তাঁর সাথে একই উটে তাঁর পিছনে বসেছিলেন হযরত যায়েদের পুত্র উসামা (রাঃ)। মক্কার সীমারেখা অতিক্রম করে নগরীতে প্রবেশের সময় মহানবী (সাঃ) উট থেকে নেমে গাধায় আরোহন করেন এবং নত মস্তকে কাবার দিকে অগ্রসর হন।

মক্কা প্রবেশের সময় রাসূলুল্লাহ্‌র ডান দিকে ছিলেন হযরত আবু বাকার (রাঃ) এবং বাম দিকে ছিলেন হযরত হযরত বিলাল (রাঃ)।

আবু জাহেল পুত্র ইকরামার নেতৃত্বে মক্কার দক্ষিণ দিকে কুরাইশগণ মুসলিমদেরকে বাধা দিতে চেষ্টা করে। এতে ২৪ জন কুরাইশ এবং বনু খোঁজা গোত্রের ২ ব্যক্তি প্রাণ হারায়।

কাবা গৃহে প্রবেশ

কাবা গৃহে প্রবেশের সময় তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌র সঙ্গে ছিলেন এরা হলেন- (১) হযরত বিলাল (রাঃ) (২) হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ), (৩) কাবার চাবি বাহক উসমান ইবনে তালহা (রাঃ)।

এ উসমানের পিতা তালহা এবং তাঁর পিতৃব্য উসমান যথাক্রমে হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত হামযাহ এর হাতে বদর যুদ্ধে নিহত হন। উসমান ইবনে তালহার

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম পূর্বপুরুষ আব্দিদদার হতে এই পরিবার ছিল কাবার চাবি সংরক্ষক।

উসমান ইবনে তালহা খন্দকের যুদ্ধে ছিল কুরাইশদের পতাকাবাহী। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর অবস্থানের পরিবর্তন হয় এত অধিক।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উসামা (রাঃ) এবং চাবিবাহক উসমান কাবায় প্রবেশ করার পর হযরত বিলাল (রাঃ) কাবাব দরজা বন্ধ করে দেন। কাবার বাইরে তখন ১০,০০০ এর বেশি মুসলিম। সকলেই কাবায় প্রবেশের জন্য ব্যাকুল।

দরজা খুলে দেয়ার পর প্রথম প্রবেশ করলেন আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)। সম্মুখেই পেলেন বিলালকে। তাকে জড়িয়ে ধরে যুবক আব্দুল্লাহ জানতে চাইলেন কাবার অভ্যন্তরে রাসূলুল্লাহ্ কি আমল করেছেন? হযরত বিলাল (রাঃ) জানালেন যে- রাসূলুল্লাহ্ কাবার ভিতরে নামাজে দাড়িয়ে গেছেন। তা দেখে ভিড় পরিহার কল্পে তিনি নিজ উদ্যোগেই কাবার দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

জুল বাজাদাইন

তাবুক অভিযান কালে হযরত বিলাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সঙ্গী ছিলেন। এ অভিযান কালে আব্দুল্লাহ নামে এক যুবক একটি কম্বল কেটে তার এক অংশ লুঙ্গির মত করে এবং অপর অংশ গায়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ্র খিদমতে হাজির হন। এই যুবকের ঘটনা ছিল পুরোপুরি মুসাইব ইবন উমায়েরের ঘটনার অনুরূপ।

পিতৃহীন আব্দুল্লাহ (রাঃ) পিতৃব্যের আদর এবং স্নেহে প্রতিপালিত হয়েছে। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর পিতৃব্য তাকে জামা-কাপড় খুলে উলঙ্গ করে বাড়ী থেকে বের করে দেন।

আব্দুল্লাহ (রাঃ) মায়ের নিকট থেকে একটি কম্বল চেয়ে নেন এবং কম্বলটি কেটে ২ টুকরো করে এক খণ্ড লুঙ্গি হিসেবে অপর খণ্ড গায়ে জড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্র (সাঃ) খিদমতে হাজির হন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আব্দুল্লাহকে "জুল বাজাদাইন" অর্থাৎ, দুই কম্বলের অধিকারী নামে অভিহিত করেন।

রাসূল (সাঃ) তাকে খুবই ভালোবাসতেন। তাবুক অভিযান কালে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আব্দুল্লাহ জুল বাজাদাইন ইন্তেকাল করেন। রাত্রি বেলা তাঁর ইন্তেকাল হয়েছিল এবং রাত্রেই তাকেই দাফন করা হয়। রাসূলুল্লাহ নিজ হাতে তাকে কবরস্থ করেন। প্রদীপ হস্তে পাশে দণ্ডায়মান ছিলেন হযরত বিলাল (রাঃ)।

সিরিয়া

হযরত আবু বকরের খিলাফতের ২৬ মাস পর হযরত উমর (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হন। এই সময়ে হযরত বিলাল (রাঃ) পুনরায় মদীনা ত্যাগের জন্য খলিফার

www.nagorikpathagar.org

উপর চাপ সৃষ্টি করেন। খলিফা তাকে মদিনা ত্যাগ করে সিরিয়ায় জেহাদে অংশ গ্রহণের অনুমতি দিয়েছিলেন। এটাই ছিল হযরত বিলালেরও কাম্য। সিরিয়ায় যুদ্ধ কালে হযরত বিলাল (রাঃ) শুধু যে একজন সৈন্য হিসেবেই দায়িত্ব পালন করেন তা নয়, তিনি ছিলেন যুদ্ধে আমীরের উপদেষ্টা।

হযরত উমরের খিলাফত কালে হযরত বিলাল (রাঃ) বেশিরভাগ সময় কাটান সিরিয়ায় যুদ্ধের ময়দানে। হযরত আবু উবায়দার নেতৃত্বে তিন বছর পর্যন্ত বিভিন্ন প্রাঙ্গণে হযরত বিলাল (রাঃ) জিহাদে নিয়োজিত ছিলেন।

সেনাপতি খালিদের বিরুদ্ধে তদন্তে

খলিফার নিকট অভিযোগ পৌছে যে কোনো এক কবির কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়ে সেনাপতি খালিদ জনৈক কবিকে বিরাট অংকের অর্থ পারিতোষিক বা উপহার হিসেবে দান করেছেন। খলিফা বিষয়টি প্রকাশ্যে তদন্ত করার জন্য সাহাবী আবু উবায়দা ইবনে যাররাকে লিখিত নির্দেশ দেন।

সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের (রাঃ) সম্পর্কে তথ্য সন্ধানের জন্য খলিফার প্রতিনিধি দল হযরত বিলাল (রাঃ) এর সহযোগীতা চান।

সকল সৈন্যদের সম্মুখে হযরত খালিদকে আহ্বান করা হয় এবং জিজ্ঞাসা করা হয় ঐ অর্থ কি তিনি তাঁর নিজের সম্পদ থেকে দিয়েছেন, অথবা বায়তুল মাল এর অর্থ থেকে দিয়েছেন। জবাবে খালিদ নিরুত্তর থাকেন।

সেনাপতি খালিদকে নির্বাক দেখে রাসূলের প্রিয় সঙ্গি এবং মুক্তদাস হযরত বিলাল (রাঃ) এগিয়ে আসেন। হযরত খালিদের মাথা থেকে পাগড়ী খুলে সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের দুই হাত এবং কোমর পাগড়ীর কাপড় দিয়ে এমনভাবে বেঁধে দেন যাতে মনে হয় হযরত খালিদ (রাঃ) একজন কয়েদী।

তারপর খালিদকে নির্দেশ করেন যে-প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। তাঁর কণ্ঠে নির্দেশের মধ্যে এমন দৃঢ়তা ছিল যে খালিদ (রাঃ) মুখ খুলেন এবং বলেন ঐ অর্থ তিনি নিজের ব্যক্তিগত তহবিল হতে দান করেছেন।

জবাবে হযরত বিলাল (রাঃ) এত আনন্দিত হয়েছিলেন যে তাঁর নয়ন যুগল থেকে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হল। তিনি দৌড়ে গিয়ে খালিদকে জড়িয়ে ধরেন। হাতের বন্ধন খুলে খালিদ (রাঃ) এর মাথায় তাঁর নিজ হাতে পাগড়ীটি পড়িয়ে দেন। যাতে মনে হয়েছিল পিতা পরম আনন্দে পুত্রের বিবাহের প্রক্কালে মাথায় পাগড়ী পড়িয়ে দিচ্ছেন।

হযরত বিলাল (রাঃ) নির্দোষ খালিদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেন, "হে খালিদ ! আমাদেরকে ক্ষমা কর।" সব বিষয়ে আমরা আমাদের নেতার নির্দেশ

www.nagorikpathagar.org

পালন করতে নির্দেশিত হয়েছি।

দ্বীনের বিচ্যুতির ব্যাপারে হযরত বিলাল (রাঃ) ছিলেন বজ্রের মত কঠোর। কিন্তু অনুসরণের প্রতিক্রিয়ায় ছিলেন শিশুর মত সরল এবং নিবেদিত প্রাণ।

হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) বায়তুল মোকাদ্দেস অবরোধ করেন। বায়তুল মোকাদ্দাসের অধিবাসীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে খলিফা হযরত উমর (রাঃ) সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করার জন্য দামেস্ক হয়ে বায়তুল মোকাদ্দেসে গমন করেন।

জাবিয়া নামক স্থানে খলিফার সঙ্গে জিহাদে রত সামরিক আমীরদের একটি পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে হযরত বিলাল (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন।

হযরত উমরের বিশেষ অনুরোধে একবার আযান দিতে হযরত বিলাল (রাঃ) সম্মত হন। হযরত বিলাল (রাঃ) আযান দিবেন এই খবর প্রচারিত হওয়ার পর বিরাট জনসমাগম হয়। হযরত বিলাল (রাঃ) যখন আযান দিতেন তখন রাসূলের কালের স্মৃতি তাঁর চোখের সামনে ভাসতে থাকত। ফলে আযানের ধ্বনি ক্রন্দনের ধ্বনীর মত মনে হতে। শ্রোতাদের মধ্যে হাহাকার এবং ক্রন্ধনের রোল উঠত।

হযরত বিলালের আযানের সময় সেনাপতি হযরত আবু উবায়দা ইবন জাররা (রাঃ) এবং মায়াজ ইবন জাবাল (রাঃ) সংজ্ঞা হারা হয়ে যান। অশ্রুতে হযরত উমরের শ্মশ্রু মন্ডল সিক্ত হয়ে গিয়েছিল।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলের মুয়াজ্জিন বিলাল (রাঃ)

মদীনায় মসজিদ-উন-নাবী প্রতিষ্ঠার পর সালাতের জন্য কিভাবে মুসলিমদেরকে আহ্বান করা হবে তা নির্ধারণের জন্য বহু শুরাহ এবং পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নাসারাদের মতো ঘন্টা বাজানো, মূর্তী পূজারীদের মত ঢোল পিটানো, ভেরী ধনী করা সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া, অগ্নী উপাসকদের মত গৃহের ছাদে আগুন জ্বালানো এবং আরও বহু ধরণের প্রস্তাব শূরায় আলোচিত হয়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হয়। একদিন সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যায়েদ খাজরাজী (রাঃ) স্বপ্নে দেখেন যে একজন ফেরেস্তা পাহাড়ে দাড়িয়ে ঘোষণা দিচ্ছেন। তিনি ঘোষণার শব্দগুলো স্বপ্নের মধ্যে মুখস্ত করেন এবং রাসূলুল্লাহকে জানান। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্‌র পছন্দ হয়। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দকে বললেন হযরত বিলালকে ঐ ঘোষণার শব্দাবলী মুখস্ত করিয়ে দিতে। এর পরই হযরত বিলাল (রাঃ) নির্দেশীত হন উঁচু স্থানে দাড়িয়ে ঐ শব্দগুলো জোরে জোরে উচ্চারণ করে মুসুল্লিদেরকে মসজিদে আহ্বান করতে। এভাবে ফজরের আযানের জন্য হযরত বিলাল (রাঃ) তা অনুমোদন করেন।

এভাবে হযরত বিলাল (রাঃ) ইসলামের ইতিহাসের প্রথম মুয়াজ্জিন হওয়ার দুর্লভ সম্মান লাভ করেন।

হযরত বিলালের কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত বুলন্দ এবং উচ্চ। তাঁর কথায়-সুরে প্রতিফলিত হত গভীর আবেগ ও তীব্র অনুভূতি। তিনি যাই বলতেন মনে হত তা তাঁর হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়। শ্রোতারা তাঁর সুললিত কণ্ঠের আওয়াজে মহাবিষ্ট বা তন্ময় হয়ে পড়ত তাঁর জবানে কিছুটা জড়তা ছিল। তিনি আরবী অক্ষর সিন, শীন, ছোয়াদের উচ্চারণ অন্যদের থেকে ভিন্নরূপ করতেন। কিন্তু তা ছাড়িয়ে উচ্চারিত শব্দের প্রভাব এত গভীর ছিল যে ঐ জড়তা কারও হাসির উদ্রেগ করত না বরং অশ্রুধারা প্রবাহিত হত।

রাসূলুল্লাহ্‌র সঙ্গে হযরত বিলাল (রাঃ) এর সম্পর্ক এত গভীর ছিল যে তিনি মসজিদের মুয়াজ্জিন নয় বরং রাসূলুল্লাহ্ মুয়াজ্জিন হিসেবে আখ্যায়িত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্‌র ইন্তেকালের পর বলা হয় হযরত বিলাল (রাঃ) মাত্র দুবারই আযান দিয়েছিলেন। একবার মদীনায় হযরত হাসান (রাঃ) এবং হুসাইনের (রাঃ) অনুরোধে

www.nagorikpathagar.org

অন্যবার দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের অনুরোধে সিরিয়ায়। দু'বারই আযান শেষে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন।

বিকল্প মুয়াজ্জিন

হযরত বিলাল (রাঃ) এর জিহবার জড়তা উল্লেখ করে সাহাবীদের মধ্যে কেউ কেউ অন্য কাউকে আযান দেওয়ার জন্য নির্বাচনের প্রস্তাব করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে তাদের পছন্দ মত একজনকে মুয়াজ্জিন নির্বাচনের আহ্বান জানালেন। এবং বললেন যাকেই তারা মুয়াজ্জিন নির্বাচিত করবেন, তাতেই রাসূলুল্লাহ্‌র সম্মতি থাকবে।

তদানুসারে রাসূলুল্লাহ্‌র পিতৃব্য হযরত হামযা (রাঃ) মুয়াজ্জিন নির্বাচিত হলেন। তিনি তিনবার ফজরের আযান দিয়েছিলেন। কোন কোন বর্ণনা মতে "একটি ফজরের আযানই তিনবার দিতে হয়েছিল। কারণ আযান দেওয়ার পরেও অন্ধকার দূরিভূত হয়নি। তৃতীয়বার আজানের পর হযরত জিব্রাইল জানালেন যে মদীনার মসজিদের আযানের স্বর বায়তুল মামুর পর্যন্ত পৌছেনি। এরপর হযরত বিলাল (রাঃ) পুনরায় মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।

ফজর সালাত কাজা হওয়ার ঘটনা

সপ্তম হিজরীতে খায়বারের কামুস দূর্গ আক্রমণ কালে ইয়াহুদীদের পরাজয় ও মুসলিমদের বিজয়ের পর মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে ওয়াদি-উল-কুরা নামক স্থানে মুসলিম বাহিনী বিশ্রামের জন্য অবস্থান করেন। সকলেই ছিল-দীর্ঘ রজনী ভ্রমণে ক্লান্ত।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সিদ্ধান্ত দিলেন যে ফজরের অল্প সময় বাকী আছে। তাই একজন জেগে থেকে অন্যরা বিশ্রাম করতে পারেন। হযরত বিলাল (রাঃ) যেহেতু নামাজের আযান দেবেন তাই তিনি জেগে থাকতে স্বেচ্ছায় রাজি হলেন। দীর্ঘ পথ ভ্রমণের শ্রমে সকলেই ছিলেন ক্লান্ত। হযরত বিলাল (রাঃ) ও ব্যতিক্রম ছিলেন না। জেগে থাকার উদ্দেশ্যে তিনি নফল নামাজ পড়া শুরু করলেন। বহুক্ষণ নফল নামাজ পড়ার পর তিনি একটি উটের হাওদায় (গদি বা আসনে) হেলান দিয়ে পূর্বমুখী হয়ে বসে পড়লেন।

ক্লান্তির কারণে যদি নয়ন যুগল বন্ধ হয়ে আসে সে ভয়ে তিনি অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য উটের গাঁয়ের সাথে নিজেকে বেঁধে নিলেন। উদ্দেশ্য নিদ্রায় চোখ বুজে আসলেও তিনি ঢলে পড়লে রশির টানে যেন টের পান। উট নড়াচড়া করলেও নিজের গায়ের

www.nagorikpathagar.org

সঙ্গে বাঁধা রশিতে টান তো পড়বেই।

উটও ছিল ক্লান্ত। তাই উটটি মাটির সঙ্গে গলা লম্বা করে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এক পর্যায়ে হযরত বিলাল (রাঃ) ও ঘুমে অচেতন হয়ে বসে রইলেন। এদিকে ফজরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে সূর্য উর্ধ্বে উঠে গেল। সর্ব প্রথম সজাগ হলেন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দেখলেন সকলেই ঘুমন্ত।

হযরত বিলাল (রাঃ) ও উটের গায়ে হেলাল দিয়ে বসে বসে ঘুমাচ্ছেন। প্রথমেই তিনি হযরত বিলালকে জাগ্রত করলেন। সকলেই ঘুম ভাঙ্গার পর সূর্যের কিরণ দেখে ইন্নালিল্লাহ্ বললেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঐ স্থানটি শয়তানের আড্ডা বলে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দ্রুত তা ত্যাগের নির্দেশ দিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হয়ে মুসলিম বাহিনীকে থামতে নির্দেশ দিলেন।

সেখানেই সকলে নামাজ আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন বললেন- যদি কেউ নিদ্রা মগ্ন হয়ে যায় এবং নামাজের কথা ভুলে যায় তবে নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ার সাথে সাথে বা নামাজের কথা স্মরণ হওয়া মাত্র নামাজ পড়ে নিবে।

ফজরের নামাজ ক্বাযা হওয়ার ঐ রাত্রিটি ইসলামের ইতিহাসে লাইলাতুল কারিশ বা তন্দ্রাচ্ছন্নতার রাত্রি বলে খ্যাত।

হযরত বিলালের উন্নত মানের রসবোধ ছিল। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিপর্যয়েও তা প্রকাশ পেত। তাঁর এক জনের ত্রুটির জন্য জামায়াতের সকলের নামায ক্বাযা হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন এর জন্য কৈফিয়ত তলব করলেন। হযরত বিলাল (রাঃ) ক্রীতদোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়ার পরিবর্তে যা বললেন, তা এরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও অন্যদের হাসির উদ্রেগ হলো। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও স্মিত হাস্য করলেন।

হযরত বিলাল (রাঃ) অন্তকরণে সাংঘাতিক অনুতপ্ত হলেও মুখে তা স্বীকার করেননি। বরং যা বললেন তা অনেকটা এরূপ ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ আমার কোন দোষ নেই। আমি তো জেগে থাকতে চেয়েছি। সকল প্রস্তুতি নিয়েছি। সাবধানতা অবলম্বন করেছি। কিন্তু আমার চেষ্টা কবুল হল না। আর বললেন-আমাদের সকলের প্রিয় যে মহান স্বত্ত্বা আপনার চোখে এবং সকলের চোখে ঘুম এনে দিয়েছিলেন তিনিই আমার চোখে ঘুম এনে দিয়েছেন। তিনি যদি আমার চোখে ঘুম এনে দিয়ে থাকেন আমি কি করে জেগে থাকব? এরূপ ভাব প্রকাশে রাসূলুল্লাহ্‌র সঙ্গে হযরত বিলালের কত নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল তা প্রতিফলিত হয়।

মক্কা বিজয়ের পর হযরত বিলাল (রাঃ) সর্ব প্রথম কাবা শরীফের ছাদের উপর উঠে আযান দিয়ে সকলকে নামাজের জন্য সতর্ক করেন এবং আহ্বান করেন।

www.nagorikpathagar.org

হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণ করার পর সর্বপ্রথম প্রকাশ্য ভাবে মুসলিমগণ কাবা ঘরে সালাত আদায় করেন। ঐ জামায়াতে ছিলেন হযরত বিলাল (রাঃ)।

কাবায় আযান

কাবার শীর্ষ হতে হযরত বিলালের কণ্ঠে আযানের ধ্বনী শুনছিলেন দূর থেকে হারিছ ইবন হিশাম, নওমুসলিম আবু সুফিয়ান ইবনে হারব এবং উত্তাব ইবন উসাইব প্রমূখ।

হযরত বিলালের ন্যায় একজন মুক্ত দাসকে কাবার ছাদের উপর উঠতে দেখে তারা হতভম্ব হয়ে যায়। কোনো ফেরেস্তাও কাবার উপরে উঠুক এটাও কাফিরদের প্রত্যাশিত ছিল না। উসাইব পুত্র উত্তাব দুঃখ করে বলেন, "একজন দাসের কণ্ঠে কাবার শীর্ষ থেকে আযানের স্বর শুনার পূর্বে আমার পিতা ইন্তেকাল করে এ দুঃখ থেকে বেঁচে গেছেন।"

বিদায় হজ্জের ভাষণ শেষে আরাফাতের প্রান্তরে আযান দেন হযরত বিলাল (রাঃ)। রাসুলুল্লাহ্‌র ইমামতিতে জোহর এবং আছর একই সময় পর পর আদায় করা হয়। দুই নামাজের জন্য পৃথক ইকামত দিয়ে ছিলেন হযরত বিরাল (রাঃ)।

বিশ্বনবীর অন্তিম সময়ে

১১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসের ৯ তারিখ শুক্রবার রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) জুম্মার নামাজ মদিনার মসজিদে আদায়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু দুর্বলতার কারণে তা সম্ভব হয়নি।

হযরত বিলাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহকে নিয়ে আসার জন্য হযরত আয়শার দ্বারে উপস্থিত হন। কিন্তু তখন তিনি ছিলেন চলনশক্তিহীন। তাই হযরত বিলালের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ খবর পাঠালেন হযরত আবু বাকারকে নামাজে ইমামতি করার জন্য।

১২ রবিউল আউয়াল সোমবার সকাল বেলা আল্লাহ্‌র রাসুল (সাঃ) ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। তাঁর পূর্বে তিনি ১৭ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে এসে আদায় করতে সমর্থ হননি। কারণ কয়েকবারই তিনি সংজ্ঞাহারা হয়েছিলেন।

এত আন্তরিকতার সাথে বিলাল (রাঃ) আযান দিতেন যে, রাসুল (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর তিনি আর আযান দিতে পারেন নি। কারণ আযানের সময় প্রতিটি শব্দে রাসূলের স্মৃতি তার মানসপটে উদিত হতো। তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন। শ্রোতারাও অভিভূত হত। তার ফলে আযান হয়ে পড়তো একটি ক্রন্দনের রোল।

www.nagorikpathagar.org

কোন কোন বর্ণনা মতে হযরত বিলাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর মুয়াজ্জিনের পদ পদত্যাগ করনে এবং মাত্র দু'বার আযান দিয়েছিলেন। একবার হযরত উমেরের খেলাফতকালে যখন খলিফা সিরিয়ায় (দামেস্কে) সফররত ছিলেন। দ্বিতীয়বার সিরিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পর হযরত হাসান (রাঃ) এবং হুসাইনের বিশেষ অনুরোধক্রমে।

রাসূলুল্লাহ্র ইন্তেকালের পর হযরত বিলাল (রাঃ) মদীনার মসজিদে আযান দিতে পারেন নি। শুধু যে আযান দেওয়াই তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন তা নয়। তিনি রাসূলের বিচ্ছেদ বেদনায় মদিনা ত্যাগের জন্য খলিফা আবু বাকারের অনুমতি চেয়েছিলেন। খলিফা আবু বাকার (রাঃ) তাকে আযানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন কিন্তু মদিনা ত্যাগের অনুমতি দেন নি। কারণ হযরত বিলালকে তিনি তাঁর উপদেষ্টা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন।

হযরত আবু বকরের নিকট হযরত বিলাল (রাঃ) নিজের দাস জীবন হতে মুক্তির জন্য চির কৃতজ্ঞ ছিলেন।

লোকেরা নিজের চোখ অপেক্ষা বিলালের আচরণে অধিকতর বিশ্বাস স্থাপন করত। মরুভূমিতে সূর্যাস্তের পরেও আলো বহুক্ষণ থাকত। সূর্যোদয়ের পূর্বেই দিক দিগন্ত আলোকিত হয়ে উঠত। তাতে রমজান মাসের সেহ্রী এবং ইফতারের বিঘ্ন ঘটত। তাই সেহরীর শেষে হযরত বিলাল সেহরীর সময় শেষ ঘোষণা দিতেন। ইফতারের সময় হলে আযান দিতেন। এর পর সকলেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতেন।

খলিফা উমর (রাঃ) পুনরায় হযরত বিলালকে মুয়াজ্জিন পদে থাকতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি সিরিয়ায় চলমান জেহাদে অংশগ্রহণ করতে চান এবং জীবনের শেয়াংশ সিরিয়াতে অবস্থান করেন। দামেস্ক শহরে তাঁকে দাফন করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

নবীর ব্যক্তিগত সহকারী বিলাল (রাঃ)

নবী পরিবারের সদস্য

হযরত বিলাল (রাঃ) অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নিকটতর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য অন্য কোন সাহাবীর হয়নি। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্র পরিবারের একজন সদস্যস্বরূপ। রাসূলুল্লাহ্র (সাঃ) এর সংসার এবং দফতরের দায়িত্বও ছিল হযরত বিলালের ওপর।

প্রতিদিন ঈমানের দাওয়াতে আহুত ব্যক্তিবৃন্দ রাসূলুল্লাহ্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। তাদেরকে হাসা মুখে গ্রহণ করা, মধুর ব্যবহার ও আহার বিহারে আপ্যায়িত করার দায়িত্ব ছিল হযরত বিলাল (রাঃ) এর। এ জন্য মদীনার মসজিদের সন্নিকটে একটি মেহমানখানাও ছিল। এই মেহমান খানার জন্য দ্রব্য সামগ্রী বন্দোবস্ত করার এবং মেহমানদারী দায়িত্ব পালন করতেন হযরত বিলাল (রাঃ)। একটি পরিবারে পিতা এবং পুত্রের মধ্যে পারিবারিক কাজে যে বিভাগ হয় এবং সংসারের জিনিষ পত্র দেখা শুনা, মেহমানদের পরিচর্যা, সকলের খানাপিনা ও আহারের ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি কাজে জ্যৈষ্ঠ পুত্রের যে ভূমিকা -সে দায়িত্ব মহানবীর সংসারে পালন করতে হয়েছে হযরত বিলালকে।

হযরত যায়েদ (রাঃ) পালক পুত্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাজ ছিল দাওয়াতী মেহনত। মহানবীর পরিবারকে যদি একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা করা হয় হযরত যায়েদ (রাঃ) পালন করতেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং সেনাপতি (রাঃ) ভূমিকা এবং হযরত বিলাল পালন করতেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর ভূমিকা। হযরত বিলালের বিশ্বস্ততা এমন পর্যায়ের ছিল যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে রাষ্ট্রীয় বায়তুল মালের দায়িত্বে নিয়োগ করেন।

যদিও হযরত বিলাল (রাঃ) ছায়ার মত রাসূলুলাহ্ (সাঃ) কে অনুসরণ করতেন (সাঃ) রাসূলুল্লাহ্ কখন তাকে খাদেম হিসেবে, দেখতেন না। দেখতেন বন্ধু হিসেবে এবং ভাই হিসেবে। বৈবাহিক সম্পর্কের দিকে তো তারা ছিলেন ভায়রা ভাই। তারা উভয়েই ছিলেন হযরত আবু বাকারের জামাতা।

রাসূলুলাহ্র দাফনের কাজে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হাজির ছিলেন হযরত বিলাল (রাঃ)। দাফনের পর চামড়ার ব্যাগে করে পানি এনে তিনিই কবরের উপরে তা

www.nagorikpathagar.org

ছড়িয়ে দেন। হযরত বিলালের কুফরের প্রতি ঘৃণা যেমন তীব্র ছিল রাসূলের প্রতি ভালোবাসাও ছিল তদ্রুপ।

আবু তালিবের গিরি উপত্যকায়

মক্কার সন্নিকটে আবু তালিবের গিরি উপতাকায় নও মুসলিমদেরকে তিন বছর পর্যন্ত আটক কালে অশেষ ক্লেশ -যাতনা সহ্য করতে হয়েছিল। মক্কার কুরাইশ এবং কাফিরগণ মুসলিমদেরকে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিকসহ সর্বভাবে বয়কট করে। তাদের সঙ্গে কার ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল। কোন প্রকার আর্থিক লেনদেনও বন্ধ ছিল।

ক্ষুধার তাড়নায় নওমুসলিম এবং তাদের সমর্থকদেরকে বহু সময় গাছের পাতা খেয়ে জীবন যাপন করতে হয়েছিল। শুকনো উটের চামড়া পর্যন্ত চুষতে হয়েছে। শিশুরা ক্ষুধার জ্বালায় কান্নাকাটি করেছে। নারীরা ছটপট করেছে।

মুসলিমদের সঙ্গে বনু হাশেম ও বনু মোত্তালিবও শিয়ারে আবু তালিব নামক গিরি উপত্যকায় বয়কটের আওতাভুক্ত ছিলেন। এই সময়ে হযরত বিলাল (রাঃ) মর্মান্তিক দুঃখ যাতনা সহানুভূতির মূর্ত প্রতীক ছিলেন এবং সে ক্ষুধার্থদের তত্ত্বাবধানে রাসূলুল্লাহ্‌র ব্যক্তিগত খাদিম হিসেবে সেবক ও সমন্বয়ক এর ভূমিকা পালন করতেন।

সফর সঙ্গী

সকল সফরে বা যুদ্ধে হযরত বিলাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্‌র সঙ্গী হতেন। ব্যতিক্রম কোনো ঘটনার উল্লেখ নেই। সফর কালে রাসূলুল্লাহ্‌র তাঁবু খাঁটিয়ে দিতেন হযরত বিলাল (রাঃ)। যখন রাসূলুল্লাহ্ কোথাও বসতেন হযরত বিলাল (রাঃ) ছায়ার জন্য পাশে অথবা মাথার উপর পর্দা টাঙ্গিয়ে দিতেন।

সফরের সময় একমাত্র বিলালের উষ্ট্রি রাসূলুল্লাহ্‌র উটের সম্মুখে চলতো। রাসূলুল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত কাসওয়া উষ্ট্রিতে এককভাবে হযরত বিলাল (রাঃ) ভিন্ন অন্য কেউ চড়তেন না।

যদিও হযরত বিলাল (রাঃ) মুয়াজ্জিন হিসেবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্‌র খাজানসী, ব্যক্তিগত সহকারী এবং ষষ্ঠী (আনাযা) বহনকারী।

আবিসীনিয়ার রাজা রাসূলুল্লাহ্‌র জন্য একটি বর্শা প্রেরণ করেছিলেন। এ বর্শাটি রাসূল বিলালকে উপহার দেন। ঈদের জামায়াতে বা সালাতে ইসতিশকার জন্য মাঠে যাওয়ার সময় হযরত বিলাল (রাঃ) এ বর্শাটি ধারণ করে রাসূলের আগে

www.nagorikpathagar.org

আগে চলতেন। নামাজের সময় হযরত বিলাল (রাঃ) রাসূলুলাহ্‌র ঠিক পিছনে দাঁড়াতেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যে সমস্ত উপহার বিভিন্ন ব্যক্তি বা বিদেশ থেকে পেতেন সেগুলো বিতরণের পূর্ব পর্যন্ত নিরাপদ সংরক্ষণের দায়িত্ব ছিল হযরত বিলালের উপর।

সত্যপ্রিয়তা

হযরত বিলালের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর সততা এবং সত্যপ্রিয়তা। একদিন তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকট রাসূলুল্লাহ্‌র একটি হাদীস বর্ণনা করেন। স্বামী বাইরে যতই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হন স্ত্রীর কাছে তার গুরুত্ব থাকে তুলনামূলক ভাবে কিছু কম।

বিলালের হাদীস বর্ণনায় স্ত্রীর অবিশ্বাসে হযরত বিলাল (রাঃ) এত ক্রুদ্ধ হলেন যে, তিনি ক্রোধ প্রকাশ না করে রাসূলের নিকট দৌড়ে গেলেন এবং ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নাম করে কেউ ভুল বা মিথ্যা বর্ণনা করবে ধারণা বা কল্পনা ছিল হযরত বিলালের নিকট অসহনীয়। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গৃহে আগমন করলেন এবং বিলাল (রাঃ) এর পত্নীকে বলেন, "বিলাল যখন আমার থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করেন তিনি বিলালের প্রত্যেকটি কথাই বিশ্বাস করতে পারেন। বিলাল কখনই মিথ্যা বলেন না। তাঁর ক্রোধের কারণ হয়ো না।"

দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব

হযরত বিলালের ধর্ম ভ্রাতা আবু রাওয়াহা আরবের একটি অভিজাত পরিবারে বিবাহের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তারা এ বিয়েতে উৎসাহ্ প্রকাশ করেনি। তিনি হযরত বিলালকে সুপারিশের জন্য অনুরোধ করেন। হযরত বিলাল (রাঃ) আবু রাওয়াহার বিবাহের তদবীরে গমন করেন।

হযরত বিলাল (রাঃ) পাত্রীর পক্ষের লোকদেরকে জড়ো করে বলেন - আমি বিলাল ইবন রাবাহ। আবু রাওয়াহা আমার (ধর্ম) ভ্রাতা। তিনি আপনাদের পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্তাপন করতে চান। তবে আমি একটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করব। আমার ভ্রাতা একজন গরম মেজাজের লোক। আমি এ বিয়ের সুপারিশ করছি। এটা আপনাদেরই সিদ্ধান্ত যে, আপনারা এ বিয়েতে সম্মত হবেন অথবা প্রত্যাখ্যান করবেন।

হযরত বিলালের উপস্থিতি ঐ পরিবারের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করল যে তারা সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন।

আবু রাওয়াহা সম্পর্কে এক পত্রে হযরত বিলাল (রাঃ) খলিফাকে সিরিয়া থেকে ভ্রাতার ব্যাপারে লিখেন-আবু রাওয়াহার নামের সঙ্গে আমার নাম সংযুক্ত করুন।

www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর এবং আমার মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করেছে তার আমি কখনও সমাপ্তি ঘটাবো।

হযরত আবু বাকার (রাঃ) জামাতা

মুক্তদাস হযরত বিলালকে আল্লাহ্‌র রাসূল (রাঃ) এবং মক্কার অভিজাত কুরাইশ নেতা আবু বাকার (রাঃ) কতো মূল্যবান মনে করতেন তা প্রমাণিত হয় আরেকটি ঘটনা থেকে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) এর পুত্রগণ একদিন তাঁদের ভগ্নীর বিবাহের জন্য পাত্র নির্বাচনের অনুরোধ জানালেন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে। রাসূলুল্লাহ তাঁর বিবেচনায় যোগ্যতম পাত্র হিসেবে এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন। সে ব্যক্তি ছিলেন হযরত বিলাল ইবনে রাবাহ (রাঃ)

বৈবাহিক সম্পর্কের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং হযরত বিলাল ইবনে রাবাহ (রাঃ) ছিলেন ভায়রা ভাই। ইসলামে সাম্যের এ রূপ তৎকালীন আভিজাত্যবাদী আরবে ছিল শুধু অকল্পনীয় তা নয়, বর্তমানেও অস্বাভাবিক।

সাইয়্যেদেনা বিলাল (রাঃ)

কথিত আছে যে হযরত উমার (রাঃ) কোন বিষয়ে হযরত বিলালকে কালো নারীর সন্তান বলে আখ্যায়িত করেন। হযরত বিলাল (রাঃ) যে হাবশী কালো নারীর সন্তান ছিলেন এতে তো কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু বিশেষণটিতে অবজ্ঞার সুর ছিল বলে হযরত বিলাল (রাঃ) তা পছন্দ করেননি। এবং তা রাসূলুল্লাহ্‌কে অবহিত করেন।

জিজ্ঞাসিত হলে হযরত উমর (রাঃ) স্বীকার করেন যে তিনি হযরত বিলালকে কালো নারীর সন্তান বলেছেন এবং যা গালির মতো অনুভূত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এটা শুনে হযরত উমরকে বলেছিলেন যে তাঁর মধ্যে জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতার দুর্গন্ধ লোপ পায়নি।

রাসূলুল্লাহ্‌র বিরক্তিতে হযরত উমর (রাঃ) নিজের আচরণে এত বেশি অনুতপ্ত হন যে তিনি হযরত বিলালকে আমৃত্যু সাইয়্যেদিনা বিলাল অর্থাৎ, আমাদের নেতা বিলাল বলে উল্লেখ করতেন। তাঁরই অনুকরণে মুসলিমগণ আজও হযরত বিলালের নামের শুরুতে সাইয়্যেদেনা বিলাল (রাঃ) শব্দটি উচ্চারণ করে থাকেন।

হযরত উমার (রাঃ) বলতেন আবু বাকার (রাঃ) ছিলেন আমাদের সাইয়্যেদ। তিনি সাইয়্যেদেনা বিলালকে মুক্তিপন দিয়ে মুক্ত করেন (বুখারী)।

www.nagorikpathagar.org

দাসদের মর্যাদা

হযরত উমারের খিলাফতকালে একটি ঘটনা হতে মুসলিম সমাজে দাসদের মর্যাদা প্রতিফলিত হয়। সুহাইল (রাঃ) ইবনে আমর বিন হারিসের নেতৃত্বে বিখ্যাত কুরাইশ নেতৃবৃন্দ হযরত উমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। খলিফা তাদেরকে বসিয়ে রাখেন। তাদের পরে আসেন মুক্তদাসদ্বয় হযরত বিলাল (রাঃ) এবং সুহায়ব বিন রুমী (রাঃ)। তাদের আগমনের খবর পেয়ে খলিফা উমার (রাঃ) তাঁদের দু'জনকে প্রথমে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করেন। এ ব্যবহারে আবু সুফিয়ান (রাঃ) দুঃখ সংবরণ করতে পারলেন না। তিনি অনুযোগের স্বরে বললেন এরূপ অপমান সহ্য করাই ছিল আমাদের ভাগ্য। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। আরবের অভিজাত নেতৃবৃন্দ দরজার সম্মুখে দাড়িয়ে থাকে। আর তাদের সম্মুখ দিয়ে পরে আসা দাসবৃন্দ খলিফার সঙ্গে সাক্ষাতের অগ্রাধিকার পায়।

সুহাইল (রাঃ) ইবনে আমর এর ঈমান আবু সুফিয়ানের (রাঃ) চেয়ের বেশি মজবুত ছিল। তিনি আবু সুফিয়ানের কথা প্রতিবাদ করে বললেন -"এর জন্য দায়ী কে? আল্লাহ্র দাঈ তো আমাদের সকলকেই আহ্বান করেছিলেন। আমরা তাকে পাগল, উন্মাদ বলে প্রত্যাখ্যান করেছি। সর্ব প্রকারে বাধা দিয়েছি অথচ এ দাসগণ তখন সকল নির্যাতন সহ্য করে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে। আমাদের ওপরে অগ্রাধিকার পাওয়ার হক তাদের এ দুনিয়ায় এবং আখিরাতেও তাই হবে। আমাদের দুঃখ বোধের কোন কারণ নেই।"

জান্নাতে বিলালের (রাঃ) পদধ্বনী

একবার আল- কুরআনের আয়াত নাযেলের সময় জান্নাত উল ফেরদাউসের দৃশ্য রাসূলুল্লাহ্র নিকট উন্মুক্ত করা হয়। আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) জান্নাতের ভিতরে হযরত বিলালের পদধ্বনি শুনতে পান। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত বিলালকে জিজ্ঞাসা করেন! 'হে বিলা ! তুমি ইসলামের জন্য এমন উত্তম কাজ কি করেছ-আমাকে জানাও। যার জন্য তুমি পাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট থেকে সবচেয়ে বড় পুরস্কার। অদ্য রজনী আমি জান্নাতে আমার অগ্রভাবে তোমার পদ-শব্দ শ্রবন করেছি।

হযরত বিলাল (রাঃ) ছিলেন মূর্তীয়মান বিনয়ী। তিনি জবাবে বলেন নফল নামাজের থেকে ভাল কিছু করেছি বলে তো আমি মনে করিনা"। অথচ তাঁর সারাটি জীবনই ছিল ইসলামের জন্য ত্যাগ এবং নেক কর্মময়। হযরত বিলাল (রাঃ) মানুষকে ভালোবাসতেন আল্লাহ্ এবং রাসূলের জন্য। ঘৃণা করতেন আল্লাহ এবং রাসূলের জন্যে। এতে তাঁর ব্যক্তিগত রুচির কোন সুযোগ ছিল না।

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট

দাস রাষ্ট্র শাসক

শুধুমাত্র সাহাবী বা ফকিহ্ হলেই মুক্ত দাস বা দাসের বংশধর যে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত হবে, তা নয়। কার যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তা থাকলে রাষ্ট্রনায়ক ও জাগতিক সুলতান, বাদশা হতেও মুক্তদাস বা তাদের বংশধরদের কোন অসুবিধা হয় না।

সতর বার ভারত বিজয়ী আফগান বীর সুলতান মাহমুদের (৯৭১-১০৩০) পিতামহ গজনীর সুলতান আলপ্তিগীন ছিলেন সামানিদ সুলতান আবদুল মালিকের একজন ক্রীতদাস। তারই ক্রীতদাস ও জামাতা সবুক্তিগীন (৯৭৭-৯৭ খ্রীঃ) ছিলেন গজনীর সুলতান। সুলতান মাহমুদ ছিলেন সবুক্তিগীনের পুত্র।

গজনীর সুলতান গিয়াস উদ্দীন ঘুরীর ভ্রাতা এবং ভারত বিজয়ী মহাবীর সিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ঘোরি (১১৭৩-১২০৩) খ্রীঃ) ছিলেন নিঃসন্তান। তিনি ক্রীতদাসদেরকে অপত্য স্নেহে প্রতিপালন করতেন। তারই ক্রীতদাস সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন - দিল্লী কেন্দ্রিক ভারত সাম্রাজ্যের সর্ব প্রথম রাষ্ট্রনায়ক সুলতান (১২০৬-১০)।

ভারতের দাস রাজ বংশের অপর দু'জন সুলতান ইলতুতমিশ এবং গিয়াস উদ্দিন বলবন ছিলেন- প্রথম জীবনে ক্রীতদাস এবং পরবর্তীতে ভারত সম্রাট ভারতে দাস বংশের ১১ জন সুলতান ১২০৬ সাল হতে ১২৯০ সাল পর্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন।

সিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ ঘোরির অপর ক্রীতদাস তাজ উদ্দিন ইয়ালদুস ছিলেন পাঞ্জাব বিজেতা এবং পাঞ্জাবে সর্বপ্রথম মুসলিম শাসনকর্তা।

সুবাহ বাংলার সর্বপ্রথম মুসলিম বিজেতা ও সুলতান ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজি (১২০১-১২০৪ খ্রীঃ) ছিলেন সুলতান সিহাবুদ্দীন মুহাম্মাদ ঘোরির (১১৭৩-১২০৬) অন্য একজন ক্রীতদাস।

দিল্লীর ন্যায় বাংলায়ও একটি হাবশী রাজবংশ এবং এ বংশের চার জন সুলতান বাংলার মসনদে আসীন ছিলেন। এ ছাড়াও বাংলায় বেশ কিছু সংখ্যক হাবশী ক্রীতদাস সুলতান রাজত্ব করেন।

www.nagorikpathagar.org

চেঙ্গিস খানের পৌত্র হালাকু খান চীন, মধ্য এশিয়া, খাওয়ারিজম, খোরাসান, তুর্কীস্থান জয় করে ১২৫৭-৫৮ সনে বাগদাদ ধ্বংস করেন এবং আব্বাসীয়া খেলাফতের সমাপ্তি ঘটান। বিশ্ব বিজয়ী হালাকু খানও মিশরের দাস রাজ সুলতান বাইবার্স এর নিকট ১২৬০ সালে পরাজিত এবং ন্যাস্তানাবুদ হন।

তুরস্কের উসমানীয়া তুর্কগণও ইউরোপ থেকে হাজার হাজার তরুণ কিশোর ক্রীতদাস ক্রয় করে "জেনিসারিস" নামক এক বাহিনী গঠন করেছিলেন। এই জেনিসারিস বাহিনী তুর্ক সুলতানদের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সেনাবাহিনী ছিল।

মিশরের আইয়ুবীয় রাজ বংশের সুলতান মালিক সালিহ্ ইউরোপ থেকে ১২০০০ শ্বেত গাত্র বর্ণের ক্রীতদাস আমদানী করে একটি ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী গঠন করেন। এই সেনাবাহিনীকে মামলুক বাহিনী বলা হত। মামলুক শব্দের অর্থ ক্রীতদাস।

মিশরের আইয়ুবী সুলতান মালিক সালিহ্র মৃত্যুর পর তার স্ত্রী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। তাকে কেন্দ্র করে দরবারের আমীরদের মধ্যে ষড়যন্ত্র ও অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

এরই সুযোগে আইয়ুবী বংশের সুলতান তুরান শাহকে নিহত করে মিশরের মামলুক বাহিনী (১২৬০) তাদেরই নিজেদের একজন সুলতান বাইবার্সকে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়।

সুলতান বাইবাস হালাকুকে মিশরে প্রবেশের সৌভাগ্য না দিয়ে সিরিয়া জর্ডানের প্রান্তরে বাধা দেন। ফিলিস্তিনের নাজারতের নিকটবর্তী আইনযালুত এর যুদ্ধে হালাকুকে পরাজিত করেন ১১ রজমান ৬৫৮ হিঃ (১২৬০ খ্রীঃ) এবং হালাকুর সৈন্যদেরকে কচু-কাটা করেন। যার ফলে দুর্ধর্ষ বীর হালাকু খান আফ্রিকা ও মিশর জয়ের স্বপ্ন বিলাস ত্যাগ করে স্বদেশ মুখি হন।

মামলুক সুলতানগণ অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে প্রায় ২৫৭ বছর (১২৬০-১৫১৭ খ্রীঃ) পর্যন্ত মিশর কেন্দ্রিক সাম্রাজ্য শাসন করেন।

১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই এপ্রিল সর্বশেষ মামলুক সুলতান তুরান বে রিদানীয়ার যুদ্ধে তুর্কী সুলতান সেলিমের নিকট পরাজিত ও নিহত হন।

মুসলিম ইতিহাসে যদি জাগতিক সুলতান, রাজা, বাদশাহ, সম্রাটদের স্থানেই দাসগণ অভিষিক্ত হতে পারেন তবে দাসদের মধ্যে যারা সাহাবী ও মহিলা সাহাবীয়া হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন- তারা বিশ্ব মুসলিমদের দৃষ্টিতে কোন স্তরে উন্নীত হবেন - তা কল্পনা করা যায় ?

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

BCBS
Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড

চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম, ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩।

ঢাকা অফিস ঃ ১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১।